ধাও গান, প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্ধ্ববেগে/অনন্ত আকাশে
উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা বিপুল নিশ্বাসে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেরর সুহৃদ ও
শুভানুধ্যায়ীদের জানাই
নববর্ষের শুভেচ্ছা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ২য় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২২

২৬ বছর পূরণ করলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

‘সেগুনবাগিচায় যখন যাত্রা শুরু করি তার তিন বছরের মাথায় ব্রিটিশ হাইকমিশনের এক ভদ্রলোক, যিনি মিউজিয়াম পারদর্শী, তিনি জাদুঘর দেখতে এসেছিলেন। তিনি সেগুনবাগিচার জাদুঘর দেখে বললেন, এরকম সারা পৃথিবীতে বহু মানুষ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। পরে দেখা যায় সেই আগ্রহটি আর টেকে না এবং অর্থাভাবে জাদুঘরটি বন্ধ হয়ে যায়। আমি আশা করছি যে এই পরিণতি এই জাদুঘর তার ভাষায় intimate এই জাদুঘর-এর এমন ভাগ্য হবেনা। আপনাদের অসীম কৃপায়, বাংলাদেশের জনগণের সহায়তায় এই জাদুঘর ২৬টি বছর টিকে রয়েছে। সেজন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই সকল দাতাকে, সকল স্মারকদাতাদের। ধন্যবাদ জানাই যারা বিভিন্ন দলিল, তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের। তা থেকে শুরু করে গতকাল সারারাত ধরে যে ছেলেমেয়েরা আলপনা এঁকেছেন তাদের।’ ২২ মার্চ ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আয়েজনের সূচনায় এভাবেই স্মৃতিচারণ করলেন প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। সকল শঙ্কার

অবসান ঘটিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কেবল ২৬ বছর পূর্ণ করলো তাই নয়, এই দীর্ঘ পথ চলায় নানা ভাবে তার সাথে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণও, এই দৃপ্ত পথচলার সমান দাবিদার তারাও।

রীতিমাফিক এবছরও আয়োজিত হয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মারক বক্তৃতা। এ বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন ‘বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা’ (বিআইডিএস)-এর মহাপরিচালক, অর্থনীতিবিদ বিনায়ক সেন। বাংলাদেশের ৫০ বছরে যে অর্জন সেই অর্জনে মুক্তিযুদ্ধের অবদান তিনি তাঁর বক্তব্যে ব্যখ্যা করেন। তিনি বলেন ষাটের দশকে জনগণ মনে করতো ঠিক আছে আমরা মনে হয় আরেকটু ভালো হবো। কিন্তু ৭১ এর পরে সাধারণ মানুষও মনে করতে থাকলো যে, সে নিজের জীবন পাল্টে নিতে পারবে, সেও একটা সম্মৃদ্ধশালী জীবনযাপন করতে পারবে। এই ভরসা, এই আত্মবিশ্বাস এলো ৭১-এর মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ বাঙালিকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলেছিলো। দ্বিতীয়ত এটার সাথে যুক্ত করা যায় আমাদের জাতীয়তাবাদ। *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ইউডার আয়োজনে রাজপথে রঙিন আলপনা ও সুরের ঝংকার

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী পালন করে ২২ মার্চ, গত কয়েকটি বছর ধরে ২১ মার্চ সূর্যাস্তের পর দিনটি যেতে যেতে রাঙিয়ে দিয়ে যায় আগারগাঁওস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তিন দিকের সড়ক। রাঙিয়ে দেয়া উৎসবের প্রাণশক্তি হচ্ছে একঝাঁক তরুণ শিক্ষার্থী। ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ (ইউডা)-এর চারুকলা বিভাগের শতাধিক শিক্ষার্থী ও তরুণ শিক্ষক ২১ মার্চ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ২২ মার্চ সূর্যোদয় পর্যন্ত সারারাত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সংলগ্ন সড়কে আলপনা আঁকার কাজটি করে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে। যে প্রতিষ্ঠানটি নবীন প্রজন্মকে তাদের শেকড়ের ইতিহাস জানানোর ব্রতে নিয়োজিত, আলপনা এঁকে সেই প্রতিষ্ঠানটির সাথে তরুণরা একাত্মতা যেমন ঘোষণা করে তেমনি মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাও নিবেদন করে। তারা স্মরণ করিয়ে দেয় মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী সমাজের তাৎপর্যবহ ভূমিকা। ২০২২ সালে আলপনা উৎসবে যুক্ত হলো নতুন মাত্রা-সুরের ঝংকার। সহপাঠী বন্ধুরা রাত জেগে কর্মযজ্ঞে মেতে উঠবে, তাদের সঙ্গী হতে, তাদের রঙের উৎসবে সুরের আমেজ দিতে এগিয়ে আসে ইউডা শিক্ষার্থীদের সংগীত সংগঠন ‘চা-রুটি-কলা’, সাথে যুক্ত হয় জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মেহনাজ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুস্মিত। ২১ মার্চ ২০২২ দুপুরের পর থেকেই জাদুঘরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়ে যায়। নবীন শিল্পীরা রং গুলতে শুরু করেন। সড়ক পরিষ্কার করে সাদা রঙের প্রলেপ দিয়ে আলপনা আঁকার জন্য প্রস্তুত করে তোলেন। তারুণ্যের মেলায় উৎসুক দর্শকের কমতি থাকেনা, পথশিশু থেকে শুরু করে পথচারী সবার মনেই রঙের ছোঁয়া লাগতে থাকে। শিক্ষার্থীদের হাকডাকে ব্যতিব্যস্ত চা-ওয়ালা মামার চা বিতরণে ক্লান্তি আসেনা। এদিকে গিটারে টুংটাং শব্দ তুলে সংগীত যেন জানান দিচ্ছে সেও তৈরি। সূর্য অস্ত যাবে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক উপস্থিত হলেন শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীকে সাথে নিয়ে, আনুষ্ঠানিকভাবে আলপনা ও সংগীত উৎসবের সূচনা করতে। তরুণদের অভিনন্দিত করে ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন এই রং যেমন সড়ককে রঙিন করবে তেমনি যেন আমাদের অন্তরকেও রাঙিয়ে দেয়। শহীদজায়া শ্যামলি নাসরিন চৌধুরী বলেন এই তরুণ বন্ধুরা তাকে আশা যোগাচ্ছে, তিনি আশ্বস্ত হচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ তারা ধরে রাখতে পারবে। তুলির টানে রেখা এঁকে আলপনা আঁকার সূচনা করেন তিনি। চা-রুটি-কলার বন্ধুদের কণ্ঠে তখন ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।’ সত্যিই এমন দেশ এমন তারুণ্য বিরল। বাইরে রাতের অন্ধকার ঘনাতে থাকে, তাতে শঙ্কার কিছু থাকেনা, আগামীকালের ভোর রঙে রঙিন হয়ে উঠবেই।

রেজিনা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*

মুক্তির উৎসব : নবীনের শপথ

আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। অন্ধকার থেকে, শৃঙ্খল থেকে, অশুভ থেকে পরিত্রান পাওয়াই মুক্তি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য পাকিস্তানি অপশাসন থেকে মুক্ত হবার লড়াই। আর গত দুটি বছর বিশ্ববাসী সংগ্রাম করছে এক মহামারী থেকে মুক্তি পেতে। মহামারীর আধাঁর গত বছর থামিয়ে দিয়েছিলো শিক্ষার্থীদের বহু প্রতিক্ষীত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের 'মুক্তির উৎসব' আয়োজনকে। করোনাভীতি কিছুটা কাটিয়ে এবছর আবারো ছাত্র-ছাত্রীদের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হলো, তবে এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে নয়, সুলতানা কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্সে নয়, আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে। ১৮ মার্চ ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আঙ্গিণা মুখরিত হয়ে ওঠে প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থীর কলতানে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে 'আমরাই গড়বো সুবর্ণ স্বদেশ' এই শপথ নিয়ে তারা এগিয়ে যাবে ভবিষ্যতের দিকে। ছায়ানটের শিল্পীদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং পতাকা উত্তোলন করার মধ্য দিয়ে শুরু হয় আয়োজন। একে একে উপস্থিত হলেন শিক্ষার্থীদের প্রিয়মুখ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, এলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম মোজাম্মেল হক, নৌ কমান্ডো শাহজাহান কবির বীর প্রতিক। ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল শিক্ষর্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুকে জানতেই হবে, এর কোন বিকল্প নেই। যদি বাংলাদেশ নিয়ে কেউ এক পাতার একটি বইও লিখতে চায় তবে সেখানেও মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু থাকবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়া আলী এবং ট্রাস্টি মফিদুল হকের উপস্থিতিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা নৌ-কমান্ডো শাহজাহান কবির বীর প্রতিক -এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে শিক্ষার্থীরা শপথ নিল-'হাজার বছরের পথ পেরিয়ে বহু শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু মহিমান্বিত নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রের আগামী দিনের নির্মাতা আমরা তাই অঙ্গীকার করি, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আদর্শ অনুধাবনে আমরা সচেষ্ট হব, সোনার বাংলা গড়তে যোগ্য ভূমিকা পালন করবো।... সবার বিকাশের জন্য আমরা বিশেষভাবে হাত বাড়াবো পিছিয়ে-পড়া মানুষের দিকে। সকল ধর্ম, জাতিস্বত্তার মানুষ, অনগ্রসর সকলে মিলে গড়বো সমৃদ্ধ স্বদেশ, যা বিশ্বের বুকে আসন নেবে মর্যাদার।' মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধ আ ক ম মোজাম্মেল হক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ' আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি, আমাদের অস্ত্র ছিল না , কিন্তু ইচ্ছা ছিল, তাই দিয়ে যুদ্ধ করলাম। আমরা জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে যুদ্ধ করেছি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ আর জয় বাংলা শ্লোগান ছিল আমাদের অস্ত্র। সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল আমাদের স্বাদীনতার স্বপ্ন।'

মঞ্চে শিশু-কিশোররা মেতে ওঠে আনন্দ আয়োজনে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং সংগঠনের শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। তাদের সাথে যুক্ত হলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, তরুণদের প্রিয় ব্যান্ডদল জলের গান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে শিশু-কিশোর আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আয়োজিত এ আনন্দানুষ্ঠানে সীমান্ত গ্রন্থাগার, শহীদ রুমি স্মৃতি পাঠাগার, ধনিয়া পাঠাগারের ক্ষুদে বন্ধুরা এবং আলোকধারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। গান-কবিতা, আবৃত্তি, নৃত্য, গীতি আলেখ্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোররা উৎসবমুখর পরিবেশে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদযাপনের এই আয়োজনকে রঙিন করে তোলে।

শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ আয়োজন: জাপান বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাপান সফরের ৫০টি অপ্রকাশিত আলোকচিত্র নিয়ে আয়োজিত ''বঙ্গবন্ধু **শেখ মুজিবুর রহমানের জাপান সফর, ১৯৭৩"** শীর্ষক প্রদর্শনী দেখে দুই-শতাধিক স্কুল পড়ুয়া শিশু কিশোর। এ প্রদর্শনীতে শিশু দিবসের বিশেষ আয়োজন হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে জাপানের ঐতিহ্যবাহী হাতে তৈরি পুতুল।

জাপান সফরকালে বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের শিশুদের হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন এমন একটি আলোকচিত্র রয়েছে প্রদর্শনীতে। মূল ছবির সাথে মিল রেখে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিশু-কিশোরদের চকলেট উপহারের আয়োজন করে। পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশস্থ জাপানের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক প্রেরিত বিশেষ উপহার জাপানের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন উপভোগ করে শিশু ও কিশোররা।

আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে টিম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি উদ্বোধন

বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এখন পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত। দেশ-বিদেশের মানুষ খুব সহজেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি পরিভ্রমণ করতে পারবেন। গত পহেলা এপ্রিল উদ্বোধন করা হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি । উদ্বোধনী বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন; ভার্চুয়াল গ্যালারির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হলো। বিশ্বব্যাপী করোনার আবির্ভাবের আগে থেকেই চিন্তা ছিলো জাদুঘরের বিস্তৃতি কিভাবে আরো ছড়িয়ে দেয়া যায় যা করোনার সময়ে আরও ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছে। আধুনিক কনসেপ্ট প্রায় সমস্ত জাদুঘরেই যেটা এখন যুক্ত হচ্ছে তাহলো ভার্চুয়াল গ্যালারি। করোনাকালে অনলাইনে বহুরকম কাজে মানুষ যুক্ত হয়েছে, হচ্ছে। ভার্চুয়াল গ্যালারি জাদুঘরকে যেই বিস্তৃতি দেবে সেটা তো কেবল দেশে নয় সেটা দেশের বাইরে; দেশের ভেতরে শহর, নগর, দূর গ্রামে। যার ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে সে স্মাটফোনে কিংবা ল্যাপটপে ভার্চুয়াল গ্যালারী পরিভ্রমণ করতে পারবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও সহজেই জাদুঘর দেখার সুযোগ পাবে এবং এখন শেখ রাসেলের নামে বিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ফলে এই ভার্চুয়াল গ্যালারি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকাইেমব নতুন মাত্রা যোগ করবে। দর্শকদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে ভার্চুয়াল গ্যালারী আরও ইউজার ফ্রেন্ডলি/ব্যবহার বান্ধব করা হবে। ভার্চুয়াল গ্যালারির অডিও'র ইংরেজি সংস্করণ করা হবে বা অনান্য ভাষাভাষীদের জন্যও আমরা আলাদা সংস্করণ করতে পারবো। আমরা এটা খুব দৃঢ়ভাবে মনে করি আরেকটি নতুন অভিযাত্রা আজকে শুরু হলো।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি নির্মাণে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে অলীক লিমিটেড। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল গ্যালারি ডেমোনেস্ট্রেশন করেন অলীক লিমিটেডের প্রতিনিধি রুদাবা তাহসিন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি পরিভ্রমণ করতে ক্লিক করুন: http://www.liberationwarmuseumbd.org/virtual-tour-of-museum/

প্রথমেই গ্যালারি পরিভ্রমণের নির্দেশিকামূলক ভিডিও এবং গ্যালারি পরিদর্শন নির্দেশিকা দেয়া আছে। নির্দেশিকাসমূহ অনুসরণ করে খুব সহজেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি পরিভ্রমণ করা যাবে।

আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে টিম, মুক্তিযুদ্ধ জাদঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত '৭ম উইন্টার স্কুল'

"থিওরি এ্যান্ড প্র্যাক্টিস অফ জেনোসাইড স্টাডিস" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড এ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে),মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে ৭ম উইন্টার স্কুলের। গত ১৫-২০ মার্চ,২০২২ এই উইন্টার স্কুল অনুষ্ঠিত হয় সাভারের শেখ হাসিনা যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে ।

প্রথম দিনের প্রথম সেশনটি নিয়েছিলেন সিএসজিজে-এর পরিচালক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, 'জেনোসাইড কনভেনশন ১৯৪৮ এন্ড ইটস আফটারম্যাথ : ডিফাইনিং দ্যা কোর ক্রাইমস' বিষয়ের উপর। তিনি অংশগ্রহণকারীদের কাছে গণহত্যার ধারণাটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

দিনের দ্বিতীয় সেশনে মূল বিষয় ছিলো– ডিফাইনিং টেন স্টেজেস অফ জেনোসাইড, এহসান মজিদ মুস্তফা, সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এই সেশনটিতে জেনোসাইডের দশটি স্টেজ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। সেশনের উপর ভিত্তি করে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মধ্যে দলীয় আলোচনা করেন।

ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমসঙ্ক নামক পরবর্তী সেশনটি নিয়েছিলেন নওরিন রহিম, সিএজজিজে কোওর্ডিনেটর। তিনি ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস-এর তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিস্তার এবং তার সাথে জেনোসাইড, আর্ম কনফ্লিক্ট, ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি, রোম স্ট্যাটুট নিয়ে আলোচনা করেন।

শেষ সেশনটির প্রতিপাদ্য ছিলো 'ফিচারস এন্ড চ্যালেঞ্জেস অফ জেনোসাইড ম্যাপিং' যখানে মূল বক্তা ছিলেন প্রফেসর ড. দারা শামসুদ্দিন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ, গণহত্যার মানচিত্রের ভিত্তি এবং এসব বিষয়ে সরকারি ডাটাবেজ ও তার প্রাপ্যতা, সরকারি নীতি নিয়ে আলোচনা করেন.

দ্বিতীয় দিনটি শুরু হয় পলিটিক্যাল আইডিওলোজিস লিডিং টু দ্যা ক্রাইম অফ জেনোসাইডঙ্ক বিষয়ক আলোচনার মধ্য দিয়ে। 'আমরা' এবং 'তারা' বিভেদের মাধ্যমে যে জেনোসাইডের বীজ ব্যাপিত হয় সে সম্পর্কে মফিদুল হক আলোচনা করেন। দ্বিতীয় সেশনে ড. সামিনা লুৎফা, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'সোশ্যাল থিওরিস রিলেটিং টু জেনোসাইড স্টাডিজ'-এর আলোচনায় জেনোসাইডের সাধারণে স্বীকৃত সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করেন এবং এরপরে জেনোসাইডের ইতিহাস এবং জেনোসাইড এর শেকড় নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার একটি দিক ছিলো কিভাবে নারীদেরকে গণহত্যার পুরো প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়।

পরের সেশন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল-এর, শুরুতে তিনি ২০১০ সালে গঠিত শিক্ষানীতি কমিশন-এ তার অভিজ্ঞতা সবার সামনে তুলে ধরেন। সকল শিক্ষার্থী যেনো দেশের ইতিহাস সম্পর্কে জানে তাই পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা যে এখনো চলমান সেই বিষয় সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেন। এরপর নওরিন রহিম আলোচনারকরেন আন্তর্জাতিক অপরাধের ক্রমবিকাশ নিয়ে।আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো আইসিসি এবং আইসিজে-এর মধ্যে পার্থক্য, এমনেস্টির মূল ধারণা, আন্তর্জাতিক আদালতসমূহে এমনেস্টির পরিস্থিতি। এহসান মজিদ মুস্তফা আলোচনা করেন আইসিটি বিডি এক্ট-এর পটভূমি নিয়ে। নাসরিন আক্তার, প্রোগ্রাম অফিসার, এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস (আজার) ট্রাঞ্জিশনাল জাস্টিস কি, ট্রাঞ্জিশনাল জাস্টিসের লক্ষ্যসমূহ, ট্রাঞ্জিশনাল জাস্টিসের ফ্রেমওয়ার্ক এবং বিভিন্ন ভাগ, বিভিন্ন ধরনের অপরাধের আন্তর্জাতিক আদলত ও তাদের প্রকারভেদ বিষয়ক আলোচনা করেন। নৈশভোজের পর ড. মানস বসু-র সাথে অংশগ্রহণকারীদের অবরুদ্ধ অশ্রুর দিনগ্ধ নামক আখ্যান নিয়ে আলোচনা হয় এবং মানস বসু তার অভিজ্ঞতা সকলের সামনে তুলে ধরেন।

তৃতীয় দিনের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিষন্ন বিকেলঙ্ক নামক ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। প্রথম সেশনের মূল বিষয় ছিলো 'রোহিঙ্গা জেনোসাইড : রেসপন্স বাই সিএসজিজে'. সেশনটি শুরু করেন শাওলি দাশগুপ্ত, পরামর্শক, লিগ্যাল এন্ড কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, ব্র্যাক। পরবর্তী সেশনের বক্তা ছিলেন ইমরান আজাদ, সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস। এই সেশনের প্রতিপাদ্য ছিলো 'ইন্টারন্যাশনাল লিগ্যাল অপশনস ফর এড্রেসিং দ্যা রোহিংগা জেনোসাইড : আইসিজে, আইসিসি এন্ড দ্যা আইওয়াইএমএম।' 'ট্রান্সিশনাল জাস্টিস ইন এশিয়া' শীর্ষক সেশনটির বক্তা ছিলেন প্যাট্রিক বার্জেস, আই-নজীবী এবং সভাপতি, এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস (আজার)। সমাজের মেজোরিটি এবং মাইনোরিটি ভেদাভেদ এবং সেখান থেকে বৈষম্য, সহিংসতার সূত্রপাত দিয়েই তার আলোচনা শুরু হয়। এরপর শুরু হয় গোলটেবিল বৈঠক যেখানে বক্তা হিসেবে ছিলেন ড. ক্যাথারিনা হফম্যান, ইউনিভার্সিটি অফ ওল্ডেনবার্গ, জার্মানি এবং ইরিনে ভিক্টোরিয়া ম্যাসিমিনো, আই-নজীবী, একাডেমিশিয়ান, আর্জেন্টিনা। এই সেশনের প্রতিপাদ্য ছিলো– রাউন্ডটেবিল ডিসকাশন অন পাস্ট জেনোসাইডস-হলোকাস্ট, আর্জেন্টানিয়ান এন্ড আদার জেনোসাইডসঙ্ক।

চতুর্থ দিনে সকালে ফিল্ড ওয়ার্কের ভেন্যু কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, মির্জাপুর, টাংগাইলঙ্ক-এর উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু হয়। সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং আয়োজক কমিটির একজন সদস্য প্রত্যেক দলের সহযোগী হিসেবে ছিলেন। সকল দল আর. পি. সাহার লাইব্রেরি পরিদর্শন করে এবং স্থানটি ছিলো আভিজাত্য পরিপূর্ণ। সেখানে আর.পি সাহা ও তার পরিবারের সদস্যাদের অনেক ছবি, প্রায় তিন হাজার বই, বিভিন্ন পুরস্কার, সনদপত্র সহ আরো অনেক মূল্যবান জিনিস সংরক্ষিত আছে।

পরে তারা সাইট দেখার জন্য যান। এবং সাইট দেখা শেষে সকলে অডিটোরিয়ামে জড়ো হয়, যেখানে হোমসের কর্তৃপক্ষ আর.পি. সাহার ঐতিহাসিক জীবন এবং মানুষ ও সমাজের জন্য বর্ণিল কাজ নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করে।

পঞ্চম দিনের শুরু হয় গত কয়েকদিনের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে লিখিত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে । পরীক্ষা শেষে শুরু হয় ফিল্ড ওয়ার্কের উপর দলগত প্রেজেন্টেশন যেখানে প্রত্যেক দল তাদের নির্ধারিত বিষয়ের উপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেজেন্টেশন প্রদান করে।

চা-বিরতি শেষে মাইগ্রেশন স্পেশালিষ্ট আসিফ মুনির মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সংগ্রাম নিয়ে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। মধ্যাহ্নভোজের পরে অংশগ্রহণকারীরা নন-জুডিশিয়াল শুনানীর প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। এই পর্বে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয় যেমন- বিচারকের প্যানেল, আপিলকারী, উত্তরদাতা, জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন, ভিক্টিমদের প্রতি-নিধি ইত্যাদি। শুনানী-টি ছিলো একটি অনুমানমূলক মামলার উপর। পঞ্চম দিন রাতে নৈশভোজের পরে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সবশেষে উইন্টার স্কুল সম্পর্কে সকলে তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আর এর মাধ্যমেই পঞ্চম দিনের কর্মকান্ডের সমাপ্তি ঘটে।

ষষ্ঠ দিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পৌছানোর পর অংশগ্রহণকারীদের গ্যালারি ভিজিট এ নিয়ে যাওয়া হয়। অডিটোরিয়ামে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়জন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মোমেনা বেগম এবং মফিদুল হক। নওরিন রহিম, উইন্টার স্কুল সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। উইন্টার স্কুলের অংশগ্রহণকারিরা ডিক্লেয়ারেশন-অফ-ইন্টেন প্রদান করার পর সবার মাঝে সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণের পর্ব শুরু হয়। সেরা নন-জুডিশিয়াল হেয়ারিং এবং সেরা একাডেমিক পারফর্মেন্স পান- তওসিফ অনিক (খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়), অর্থী নবনীতা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং প্রান্তর কুমার মন্ডল (ইঞ্জিনিয়ার)।

তনিমা তাহসিন

তাঁদের মৃত্যু থাকতে নেই

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি রবিউল হুসাইন, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী এবং আলী যাকের স্মারকগ্রন্থ 'সতত তোমাদের স্মরি' প্রকাশনা অনুষ্ঠানে লেখিকা ও ভারতেশ্বরী হোম-এর শিক্ষক হেনা সুলতানা ট্রাস্টিদের সম্পর্কে বলেন, কোনো প্রথাগত জাদুঘর নয় তাঁরা গড়ে তুললেন মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব ও সশস্ত্র যুদ্ধের বীরত্ব এবং বেদনার সর্ববৃহৎ সংগ্রহশালা। ফলে এ জাদুঘর কেবল অতীতাশ্রয়ী না হয়ে, হয়ে উঠেছে ভবিষ্যৎমুখী। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি এই বোধ থেকেই সেই যুদ্ধের পতাকা তাঁরা তুলে দিতে চান নতুন প্রজন্মের হাতে। এখানেই তাঁরা অনন্য, আলাদা। তাঁদের মৃত্যু থাকতে নেই।

হেনা সুলতানা জিয়াউদ্দিন তারিক আলীকে স্মরণ করে বলেন, শহীদ দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহার ছেলে শহীদ ভবানীপ্রসাদ সাহার বন্ধু ছিলেন তিনি। এই পরিবারের সুখ-দুঃখের সাথী ছিলেন। পুজোর সময়টাতে দেশে থাকলে তারিক ভাই যথারীতি ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই উৎসবে যোগ দিতেন। ছাত্রীদের সাথে বসে গান গাইতেন। তাদের সাথে ছিল গভীর আত্মীক সম্পর্ক। তিনি ভারতেশ্বরী হোমসের মেয়েদের 'মুক্তির গান' দেখিয়েছিলেন। খাঁচায় ময়না পাখি হাতে তরুণ তারিক ভাইকে চিনতে পেরে মেয়েরা তারিক ভাই তারিক ভাই বলে যত চিৎকর করে তিনি তত জোরে 'জয় বাংলা' বলে স্লোগান দিতে থাকেন। সব শেষে সম্মিলিত গান 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান' গাইতে গাইতে ঝরঝর করে কাঁদছিলেন।

রবিউল হুসাইন সম্পর্কে 'কবিতায় স্থাপত্য কিংবা ঝিনুকের এক জীবন' নামে স্মৃতিচারণ এবং বক্তব্য উপস্থাপন করে দীর্ঘদিন তাঁর সান্নিধ্যে থাকা স্থপতিহাজী গোলাম নাসির বলেন, আমাদের জন্য কেউ একজন ছিলেন কিন্তু এখন নেই! আছে এবং নেই-এর মাঝে শূন্যতার যে ব্যাপ্তি, কষ্টের যে তীব্রতা তা অনুভবে নিতে হলে, যার জন্য হৃদয়ের এ ক্ষরণ তাকে চিনতে হয়, অনুভবে নিতে হয়। তিনি একজন স্থপতি, কবি, শিল্পসমালোচক, ছোটগল্পকার, প্রবন্ধিক ও সংস্কৃতিকর্মী। ছিয়াত্তর বছরের এক জীবন, সে জীবন সংগ্রামের, কষ্টের আনন্দের আর সৃষ্টিঘেরা ভালোবাসার। এই প্রসঙ্গে কাজী গোলাম নাসির রবিউল হুসাইনের জীবনের নানাদিক তুলে ধরে ব্যতিক্রমী প্রকাশনা 'না'-এর সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

আলী যাকের সম্পর্কে আলোচনা করেন সংস্কৃতিকর্মী শংকর শাওজাল। তিনি বলেন, আলী যাকের নাটকের লোক, সাথে বাড়তি ছিল যে তিনি ছবি তোলেন। তার ছবি ব্রিটিশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। তখন মনে হতো এই মানুষটাকে যদি ছুঁয়ে দেখতে পেতাম! পরে ১৯৮৭ সালে টেমপেস্ট নাটকে আলী যাকেরের কাছে আসা হল। আলী যাকের গায়ে নখের আঁচড় কেটে বলতেন, আমরা সবাই মাটির সন্তান এই দেখ গায়ে খড়ির দাগ পড়ে যায়। মানুষকে ভালোবাসতে হবে, দেশটাকে ভালোবাসতে হবে। আমি একটা স্ক্রিপ্টে সন্তানের উপমা হিসেবে লিখেছিলাম 'মায়ের নাড়িছেঁড়া ধন'। তিনি তাতে আপ্লুত হয়েছিলেন, তিনি দুশো বালিকার ছবি তুলেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি নারীশক্তির প্রকাশ ঘটাতে চেয়ে মাতৃকূলকে ধরে রেখেছেন। শংকর শাওজাল জোর দিয়ে বলেন, পাঠ্যসূচিতে আলী যাকেরের মতো সকল বরেণ্য মানুষের পরিচিতি সংযুক্ত হলে মনে হয় জাদুঘরের কাজটা আরও বেশি এগিয়ে যাবে।

এর আগে স্বাগত ভাষণে জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি সারওয়ার আলী বলেন, মনে পড়ে সেগুনবাগিচায় জাদুঘর গড়ে ওঠার সেই পুরানো বাড়িটি দেখে আমরা যখন সেটাকে বাতিল করে দিচ্ছিলাম তখন স্থপতি রবিউল হুসাইন মুগ্ধ হয়ে বাড়িটি দেখছিলেন। এবং বাড়িটিকে তিনি জাদুঘরে রূপান্তরিক করেন। আর এই যে বিশাল অট্টালিকা দেখছেন এক একর জমির উপর এর সমস্ত খুটিনাটি নিখুঁতভাবে তৈরির প্রয়াস নিয়েছিলেন প্রকৌশলী জিয়াউদ্দিন তারিক আলী। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে পতাকা উত্তোলনের সময় জাতীয় সঙ্গীদের 'মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি' গাওয়ার সময় এই মানুষটির দুচোখে অশ্রু ঝরে পড়তো। আলী যাকের নাট্য ব্যক্তিত্ব। জাদুঘর পরিচালনার নীতিনির্ধারণ নিয়ে আমরা যখন ব্যস্ত তখন সবচেয়ে মূল্যবান পরামর্শটি দিয়েছিলেন তিনি। আলী যাকের বলেছিলেন, কাট অব পয়েন্ট হবে ১৬ ডিসেম্বর। বিজয় অর্জনের পরের বিষয়গুলো জাদুঘরে প্রদর্শিত হবে না।

প্রকাশনার সম্পাদক বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন সম্পাদকীয়তে বলেছেন, স্বল্প-সময়ের ব্যবধানে, এক বছরের মধ্যে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নির্মাণ ও রূপদানকারী তিনজন প্রতিষ্ঠাতা-ট্রাস্টির জীবনাবসান আমাদের সবার জন্য হয়েছে অত্যন্ত দুঃখজনক। এই জাদুঘরের পরতে পরতে মিশে আছে তাঁদের অবদান ও স্মৃতি। সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী বহুমুখী কর্মকাণ্ডে তাঁদের নিরন্তর সৃষ্টিশীল ভূমিকা জাতির জন্য হয়েছিল বিশেষ ফলপ্রসূ এবং তাঁদের প্রয়াণ দেশের জন্যও হয়েছে অপূরণীয় ক্ষতি।

শোকের এই আবহের মধ্যেও আমরা প্রয়াত ট্রাস্টিত্রয়ীর কথা স্মরণ করে নতুন প্রেরণায় উজ্জীবীত হই, শক্তি পাই তাঁদের অবদান ও সৃষ্টিশীলতা স্মরণ করে। তাঁরা রেখে গেছেন অশেষ সুকৃতি, যা নতুন প্রজন্মের পথচলায় প্রেরণার উৎস হতে পারে। অনুষ্ঠানের শেষে প্রয়াত তিন ট্রাস্টির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে উদ্বোধন করা হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি।

সত্যজিৎ রায় মজুমদার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ সেমিনার

১৯৭১ এর বাংলাদেশ জেনোসাইড

রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কিংবা অন্যতর স্বার্থে একটা জাতিকে বিনষ্ট করার নোংরা খেলা যেন এই গণহত্যা। এমন ঘৃণ্য অপরাধ চরম মানবতাবিরোধী, বিশ্বজুড়ে কোথাও যার কোনো ক্ষমা হতে পারেনা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালিদের জন্য সেই ভয়াল কালো রাত। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসেও আমাদের বার বার ফিরে যেতে হয় সেই ২৫ মার্চ কালরাতে। কেননা এই রাতের ক্ষতিপূরণ কখনো সম্ভব না।

এ বছর ২৫ মার্চ শুক্রবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এর সম্মিলিত আয়োজনে আয়োজিত '১৯৭১-এর বাংলাদেশ জেনোসাইড' সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা গ্রেগরী স্ট্যান্টন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে এম আব্দুল মোমেন, ড. হেলেন জারভিস সহ আরো অনেকে। পুরো সেমিনারটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ এবং সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের পরিচালক মফিদুল হক।

সেমিনারের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ডিনায়েল বা অস্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি আদায়। গ্রেগরী স্ট্যান্টন তার বক্তব্যে বিশেষভাবে জোর দেন এই ডিনায়েলের উপর। তিনি গণহত্যার বহুল আলোচিত সেই দশ ধাপের কথা বলেন। তিনি আলোচনা করেন কিভাবে একটি জাতি শ্রেণিবিভাগ, প্রতীকীকরণ, বৈষম্য, বিমানবিকীকরণের শিকার হয়ে আস্তে আস্তে চক্রান্তকারীদের ঘৃণ্য পরিকল্পনা আর গণহত্যার শিকার হন। আর চক্রান্তকারীরা কিভাবে অস্বীকৃতি দেখিয়ে সেই গণহত্যার গ্রহণযোগ্যতাকে দূরে ঠেলে দেয়। তিনি বলেন, গণহত্যা, জাতিতে জাতিতে রোষানল, এগুলো নিঃশেষ করা যাবে একমাত্র পরস্পরের প্রতি ভালবাসা আর শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা।

ড. হেলেন জারভিস বিশ্বে গণহত্যার অস্বীকৃতির বিভিন্ন ইতিহাস তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন আন্দোলন, গবেষণা এবং দ্বিপাক্ষীয় বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টায় উৎসাহ দেন। পুরো অর্ধদিবস ব্যাপী পরিচালিত এই সেমিনারে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। ছিল তরুণ প্রজন্মের সদস্যদের সরব উপস্থিতি।

অর্থী নবনিতা

Exposition of Young Film Talent - 2022

টানা চতুর্থ বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়ে গেল Exposition of Young Film Talent-এর বাছাই ও পুরষ্কার ঘোষণা পর্ব। এ বারের সেরা প্রজেক্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে মোহাম্মদ মাসুদুর রহমানের The Scrap। রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট গ্রান্ট পেয়েছেন লাবনী আশরাফির প্রজেক্ট My Mother Can Sing But She Doesn't। এ বছর ঢাকা ডকল্যাব এওয়ার্ড পাওয়া দুইটি প্রজেক্ট হলো শামসুল ইসলাম স্বপনের The Tale of An Angler and His Otters ও জাফর মুহাম্মদের 'পানকৌড়ি'। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশের সম্পুরক অংশ হচ্ছে তরুণ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এরই ধারাবাহিকতায় গত বছরের শেষে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের জন্য আইডিয়া আহবান করা হয়।

১ম ধাপে বাছাইকৃত সেরা ৩০টি আইডিয়া নিয়ে গত ২১ থেকে ২৫ জানুয়ারি অনলাইন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। এই ওয়ার্কশপে মেন্টর হিসেব ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেস্টিভ্যাল পরিচালক ও ঢাকা ডকল্যাবের পরিচালক তারেক আহমেদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা নরুল রাশেদ চৌধুরী, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা ফরিদ আহমেদ ও এলিজাবেথ ডি কস্তা। মেন্টররা পিচিং সেশনের মাধ্যমে ১২টি আইডিয়াকে পরবর্তী ধাপের জন্য বাছাই করেন। ১২টি প্রজেক্ট হলো- গাড়ো পাহাড়ের একাত্তর (অরুণাভ দাস), পানকৌড়ি (জাফর মুহাম্মদ), My mother can sing but she doesn't (লাবণী আশরাফি), Curse Towards Dhaka (মাঈশা মালিহা মৌ ও ইবতেশাম), লেঠেল (রাসেল রানা দোজা), The Scrap (মো. মাসুদুর রহমান), বিনোদবাড়ির মানকোন গণহত্যা (মো. রাশিদুল ইসলাম), Rebirth- Pain of Hapoiness (ফারহানা ইসলাম), ভোঁদর মাঝির ইতিকথা (সামছুল ইসলাম স্বপন), Memory Bearer (মামুন অর রশীদ), Beauty of Harvest (মো. আল হাসিব খান আনন্দ), Diaries of Nazma (এস এম মনোয়ার জাহান রনি)। উক্ত ১২টি প্রজেক্টকে ২ মাস সময় দেয়া হয় আইডিয়াকে আরো বিস্তর করতে এবং ১০ মিনিটের ভিডিও ফুটেজ জমা দেওয়ার জন্য।

Exposition of Young Talent-এর দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয় গত ৩০ মার্চ থেকে। অনলাইনে ৪ জন মেন্টর টানা ৫ দিন ওয়ার্কশপ ও পিচিং সেশন পরিচালনা করেন। মেন্টর হিসেবে ছিলেন ডকএজ কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা নিলৎপল মজুমদার, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রডিউসার পঙ্কজ যোহর, লেখক ও নির্মাতা দীপা ধনরাজ এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা নুরুল রাশেদ চৌধুরী।

সর্বশেষ গত ৮ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে ১২ জন প্রতিযোগি ফাইনাল পিচ দেন ও ৩ মিনিটের প্রজেক্ট ট্রেইলর প্রদর্শন করেন। হাইব্রিড এই অনুষ্ঠানে মেন্টররা অনলাইনে যুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সদস্য-সচিব সারা যাকের। এ সময় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ড. সারোয়ার আলী ও মফিদুল হক উপস্থিত ছিলেন। ওই দিন বিকালে আনুষ্ঠানিক পুরষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়। সেরা দুইটি প্রজেক্ট চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ক্রমান্বয়ে ৫ লাখ ও ৩ লাখ টাকা পুরষ্কার হিসেবে পান।

https://drive.google.com/drive/folders/1nlrehjplDGiJeFx8vybm46Jl6QLz1NI6?usp=sharing

জুবাইরিয়া আফরোজ বিনতি

পাবনা জেলার তিন উপজেলায় ঘুরে এলো ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর

পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলা প্রশাসনের আমন্ত্রণে ''নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ'' শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১৬ মার্চ ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে পাবনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। এবারের রিচআউট প্রোগ্রাম ভাঙ্গুড়া উপজেলা প্রশাসনের আমন্ত্রনে আয়োজন করা হযেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রিচআউট কর্মসূচির তৃতীয় পর্বের কাজ আমরা এবার পাবনা জেলার ৯টি উপজেলার মধ্যে প্রায় ৩ টিতে বেশ সফলভাবে বাস্তবায়ন করে এসেছি। পাবনা জেলার (আসন-৩) আলহাজ্ব মো. মকবুল হোসেন (এমপি) ও ভাঙ্গুড়া উপজেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ভাঙ্গুড়া উপজেলা পরিষদ এবং ভাঙ্গুড়া পৌরসভায় আমাদের ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের বাসটি বেশ নিরাপদেই ছিল। উপজেলা প্রশাসন আমাদের এবার খুব সহায়তা প্রদান করেছে। উপজেলা প্রশাসক মো. নাহিদ হাসান খান, পৌরমেয়র মো. রাসেল এবং পাবনা পদযাত্রী দলের কর্ণাধার ড. মো. জাহিদ হাসান আমাদের সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

পাবনার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল খুব সমৃদ্ধ মনে হলো এবং এখানে নিজস্ব লোকগানও রয়েছে। ভাঙ্গুড়া উপজেলা পরিষদের মুক্ত মঞ্চে 'মুক্তির উৎসব ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাবনা জেলা ৭নং সেক্টরের অধীনে ছিল। এ জেলায় মুক্তিযুদ্ধের বেশ গৌরবজনক ইতিহাস রয়েছে। পাবনার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেশ কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। প্রদর্শনী সময়ে স্মৃতিচারণে পাবনার চাটমোহরস্থ 'হান্ডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়-এর সহকারি প্রধান শিক্ষক বলেন, ১৯৭১ সালের ২২ এপ্রিল রোজ শনিবার চাটমোহর থানায় পাকসেনারা লুটপাট করে। এ লুটের ঘটনার সময় সেদিন ৩ জন নিরীহ ব্যক্তি শহীদ হন। সেদিন একজন স্থানীয় বিহারী পুলিশ (নাম উকিল) পাকসেনাদের সাথে উর্দুতে কথা বলে অনেক বাঙালি লোকের প্রাণ বাঁচিয়ে দেয়। তখন মিলিশিয়ারা চাটমোহরে ঘাঁটি গেড়ে থাকতো। এসময় ওরা নিরীহ লোকদের বাড়ি ঘরে গিয়ে হাঁস-মুরগী-ছাগল-গরু লুটপাট করত। পাবনা জেলা ও উপজেলার প্রান্তিক এলাকার আশেপাশে বেশ কয়েকটি বধ্যভূমি রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বধ্যভূমি- রামনগর বধ্যভূমি, হাদল বধ্যভূমি, ডেমরা বধ্যভূমি। এসব বধ্যভূমি গুলোর অনেক গুলোতেই স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়নি। ভাঙ্গুড়া উপজেলা বাসী মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণে বড়াল রেলব্রিজের পাশে বাস স্ট্যান্ড এলাকায় ২০১৫ সালে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য যে, ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলেও পাবনায় ঢুকতে পারেনি মুক্তিযোদ্ধারা। ১৮ ডিসেম্বর পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে। এখন যার নামে পাবনার পৌরমঞ্চ সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল- এর কাছে পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

পরিসংখ্যান: এবার পাবনা জেলায় ০৯টি উপজেলার মধ্যে ০৩টি উপজেলাতে মোট ১২ কার্যদিবসে ০৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ৫,১৭২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪,১৪১জন শিক্ষার্থী এবং ৯৪৫০জন সাধারণ দর্শক আমাদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা নিম্নরুপ- সরকারি ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, জরিনা রহিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ভাঙ্গুড়া মহিলা ডিগ্রি কলেজ, হান্ডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, ভেরামারা উদয়ন একাডেমী, বনওয়ারী আলিম মাদ্‌রাসা এবং পাটুলিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার ব্যাপারে নতুন প্রজন্মের আগ্রহ এবং শিক্ষকদের সহায়তা আমাদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আরও বাড়িয়ে তুলছে ।

হাকিমুল ইসলাম
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আমিন চৌধুরী

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আমিন চৌধুরী। গ্রাম ডোমখালী। থানা ও উপজেলা মিরেরসরাই। জেলা চট্টগ্রাম। রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হিসেবে আমি করম আরী হাই স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় থেকে ছাত্র লীগের সদস্য ছিলাম। আমার চাচা কাশেম মোক্তার মিরসরাই আওয়ামী লীগের সভপতি ছিলেন। সত্তর সালে এমআর সিদ্দিকী সাহেব আমাদের এমএলএ নির্বাচিত হন। একাত্তর সালে আমি ওমর আলী হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। মার্চ মাসের শুরু থেকে চরম উত্তেজনা। পঁচিশে মার্চ মিরসরাই দক্ষিন এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডে আমরা রাস্তায় ব্যারিকেড দেই। এপ্রিলের প্রথম সাপ্তাহে আমি এবং আমার ভাই ফুফাতো ভাই সারারাত পায়ে হেঁটে শ্রীনগর নামক জায়গায় পৌঁছে একটি খাল পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করি। সেখানে গিয়ে আমার কাকার খোঁজ করি। পরে হরিনা গিয়ে কাকার সাথে দেখা হয়। সেখানে প্রতিদিন লাইনে দাঁড়াই সাইজে ছোট বলে আমাদেরকে নেয় না। আমাদের প্রবল আগ্রহের কারণে একটা সময় পর সুযোগ পেলাম। আগরতলার এক পাহাড়ি এলাকায় ব্রেভো কোম্পানীতে প্রশিক্ষন নিলাম। ট্রেনিং চলাকালীন এক করুন ঘটনা ঘটলো– আমাদের সাথের একটা ছেলে গ্রেনেডের পিন খুলতে গিয়ে মারা গেলো। ছয় সপ্তাহের ট্রেনিং শেষে হরিনা আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে আসল। এখান থেকে পচাত্তর জনের একটা গেরিলা টিমের সাথে ফেনী নদী দিয়ে নৌকা যোগে দেশের ভিতর ঢুকলাম। সেসময় শুভপুর ব্রীজে পাকআর্মির কড়া পাহারা। তাই রাতের বেলায় জোয়ারের সময় আসতে হলো। আমরা ইছাখালী নামে যে এলাকায় পৌঁলাম সেখানে কয়েকজন নকশালের উৎপাত ছিল। আমরা তাদের একজনের বাড়ি ঘেরাও করলাম। গ্রামবাসী আমাদেও উপর খুশি হয়ে খাবার দাবারের ব্যবস্থা করলো। সেখান থেকে এগারো জনের একটা গ্রুপের সাথে আমি মিরসরাইয়ের দক্ষিনে বদ্দারহাট-সিতাকুণ্ড এলাকায় আসলাম। গ্রুপ কমান্ডার আমাদের দুজনকে হাটের দিন বদ্দারহাট বাজারে গ্রেনেড চার্জ করতে পাঠালেন। কথা ছিল ফাকা জায়গায় গ্রেনেড

মারতে হবে। কোন মানুষ মরবে না কিন্তু আওয়াজ দিতে হবে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। প্রথম দিন পারলাম না। দ্বিতীয় দিন আমি সফলভাবে গ্রেনেড চার্জ করতে পারলাম। এভাবে আমরা এলাকার মধ্যে গেরিলা কায়দায় ছোটখাটো অপারেশন করতে থাকলাম। রাজাকাররা আমাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলো। এরআগে সেদিন তারা করম আলী বাজার, আরও একটা বাজার ও গ্রামের হিন্দু বাড়ি পুড়িয়ে দিলো। আমরা গেরিলা মাত্র এগারোজন ছিলাম এবং আমাদের কাছে মাত্র কয়েকটা গ্রেনেড, একটা রাইফেল, একটা স্টেনগান এবং একটা মেশিনগান ছিল তাই রাজাকার ও পাকবাহিনীর বিশাল বাহিনীর অপকর্ম দূর থেকে দেখতে হলো। ওদেরকে প্রতিরোধ করতে পারলাম না। পরবর্তীতে বড়ুয়াপাড়া বাজার পুড়িয়ে দিলে নিজামপুর এবং দমদমা এলাকায় আমরা রাজাকারদের শায়েস্তা করতে পেরেছিলাম। এভাবে সেপ্টেম্বও মাস পর্যন্ত অনেক ছোট ছোট যুদ্ধ হয়েছে, সর্বশেষ ভূঁয়ারহাটের যুদ্ধে আমরা তিনটি গ্রুপ এক সাথে ওদেরকে আক্রমণ করলে ওরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এর মধ্যে আমাদের অস্ত্র ও লোকবল বৃদ্ধি পেয়েছে। সেসময় আমাদের সিএনসি কমান্ডার ছিলেন জাহিদ নামের একজন। অক্টেবরের পর রাজাকারদের কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। নভেম্বর থেকে সরাসরি পাক-বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু হয়। তখন আমাদেও ক্যাম্প ছিল দমদমায়। ২৭ নভেম্বর পাকবাহিনীল সাথে যুদ্ধে শাহালম নামে আমদের একজন সাথী শহিদ হন। আমার গায়েও দুটি স্প্লিন্টার লাগে। কুমিরাতে মিত্রবাহিনীর সাথে পাক-বাহিনীর একটা বড় যুদ্ধ হয়েছে। শুভপুর ব্রিজ ভাঙার পর বাইরের পাকবাহিনীকে আমরা আর ঢুকতে দেইনি। রেল লাইনও অকেজো কওে দেয় হয়। এভাবে ৮ ডিসেম্বর মিরসরাই মুক্ত হলো। আজারুসালাম নামের এক রাজাকার মানষ জবাই করতো, বিজয়ের পর গ্রামবাসীর গণধোলাইতে সে মারা যায়। আমরা চট্টগ্রামের দিকে আগাতে থাকলাম। ১৬ ডিসেম্বরের পর আমাদেরকে ভাটিয়ারিতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে নিয়মানুযায়ী আস্তে আস্তে যে যার বাড়ি ফিরলাম।

সাক্ষাৎকার গ্রহীতা : **শরীফ রেজা মাহমুদ**

জল্লাদখানা প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা উৎসব- ২০২২

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিবছর মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে আয়োজন করে তিনদিনব্যাপী স্বাধীনতা উৎসবের ও বিজয় উৎসবের। তারই ধারাবাহিকতায় গত ২৪, ২৫ ও ২৬ মার্চ জল্লাদখানা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল স্বাধীনতা উৎসব-২০২২। জল্লাদখানা বধ্যভূমির সামনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন কর্তৃক নবনির্মিত 'শিশুবান্ধব গণপরিসর' এর উন্মুক্ত মঞ্চে প্রথমবারের মত আয়োজিত হয় এই উৎসব। ২৪ মার্চ উৎসবের প্রথম দিন স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও স্মৃতিচারণ করেন শহিদ আব্দুল হাকিম-এর পুত্র আব্দুল হামিদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক। উপস্থিত ছিলেন একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় ওয়াইডব্লিউসিএ ফ্রী স্কুলের শিক্ষার্থীদের দেশমাতৃকার গান ও মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। পর্যায়ক্রমে স্বপ্নবীনা শিল্পকলা বিদ্যালয়ের ছোট্ট শিশুশিল্পী বন্ধুরা, ঘাসফুল শিশু-কিশোর সংঘ, মুকুলফৌজ মিরপুর ৬ নং শাখা শিল্পীবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গান, কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান পরিবেশন করে পঞ্চায়েত শিল্প-সংস্কৃতি কেন্দ্র। অপেরা নাটকের দলের 'পাখির ভবিষ্যৎ' নাটকের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় প্রথম দিনের আয়োজন।

২৫ মার্চ - জাতীয় গণহত্যা দিবস

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে হত্যার শিকার শহীদ আক্রব আলীর পুত্র মোঃ ফরিদুজ্জামান ও শহীদ নয়া মিয়ার পুত্র মোঃ হায়াতুল ইসলাম অনুষ্ঠানের শুরুতে স্মৃতিচারণ করেন। আরো বক্তব্য রাখেন 'সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম-মুক্তিযুদ্ধ ৭১'-এর মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবিব ও বীর মুক্তিযোদ্ধা লায়লা হাসান। উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ম হামিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমরুল চৌধুরীসহ ফোরামের সাথে যুক্ত সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ। জল্লাদখানার সামনে ফোরাম মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে ও সন্ধ্যায় জল্লাদখানা স্মৃতিপীঠে মোমবাতি প্রজ্জ্বালন কর্মসূচি পালন করা হয়। বধ্যভূমির সন্তানদল একাত্তরে শহীদদের স্মরণে 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' ও 'সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের' গান দুটি পরিবেশন করে। মিরপুর সাংস্কৃতিক ঐক্য ফোরাম মশাল মিছিল নিয়ে জল্লাদখানা এসে শহীদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বালন করে। রাত ৯.০০- ৯.০১ মিনিট 'ব্ল্যাক আউট' কর্মসূচি পালন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে বার্ডো গণহত্যা বিষয়ক গান ও কবিতা পরিবেশন করে। পর্যায়ক্রমে আনন্দলোক সাংস্কৃতিক একাডেমি, বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টস, বধ্যভূমির সন্তানদল, মিথস্ক্রিয়া আবৃত্তি পরিসর ও ঝিনুক শিশু-কিশোর সংঘ গণহত্যা বিষয়ক গণসংগীত ও কবিতা পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয় জাতীয় গণহত্যা দিবস পালনের আয়োজন।

২৬ মার্চ - মহান স্বাধীনতা দিবস

মহান স্বাধীনতা দিবস-এ অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্মৃতিচারণ করেন শহীদ খোন্দকার আবু তালেব পুত্র খোন্দকার আবুল আহসান, শহীদ কাসবাদ্দৌজার কন্যা শাহিনুদ্দৌজা শেলী। একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়ারেন্ট অফিসার মোখলেসুর রহমান তাঁর যুদ্ধকালীন সময়কে স্মৃতিচারণ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢাকা সিটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের জীবনী উপস্থাপন করে। বধ্যভূমির সন্তানদল স্বাধীনতার গান ও দেশমাতৃকার গান পরিবেশন করে। যুব বান্ধব কেন্দ্র (বাপসা) নৃত্যশিল্পীরা মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে। সংগীত সমাজ কল্যাণপুরের প্রবীণ শিল্পীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান পরিবেশন করে। যে গানগুলি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি জুগিয়েছে। সাত্ত্বিক নাট্য সম্প্রদায়ের 'রাজার চোখ বন্ধ রাজার চোখ অন্ধ' নাটকের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয় তিনদিন ব্যাপী স্বাধীনতা উৎসবের।

প্রমিলা বিশ্বাস, সুপারভাইজার, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

১ এপ্রিল প্রয়াত হলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মী হাসান আরিফ। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে তার লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হলো

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : আমাদের ক্রান্তিকালের প্রেরণা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মন ও চিন্তায় কাছাকাছি আটজন মানুষ গড়ে তুলেছেন। তাঁদের প্রত্যেককেই আমি আন্দোলনের মধ্যদিয়ে চিনেছি ও জেনেছি। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে তাঁরা আমাদের প্রথম সারির মানুষ। আমি কিশোর উত্তীর্ণ সময়ে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হই সাংগঠনিক আবৃত্তির সূত্রে।ফলে তাঁদের নেতৃত্বে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন চলাকালেই ব্যাক্তিগত সান্নিধ্যে আসি। প্রত্যেকেই খুব স্নেহ করতেন। এরই মধ্যে '৯২ এ শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আন্দোলন শুরু হলো। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গঠনের আটজন ট্রাস্টি তাঁরা প্রত্যেকেই সেই আন্দোলনের প্রথম সারিতে সক্রিয়। নানান ধরনের সৃজন-ভাবনা ও আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে নিয়মিত যোগাযোগ হয়। তাঁদের নির্দেশ মান্য করে আমরা তরুণরা সক্রিয় থাকি আন্দোলন সংগ্রামে। একদিন ডাক পড়লো ৫ নম্বর সেগুনবাগিচায়। কেন তা পরিস্কার নয়। সেই ভগ্ন বাড়ির দোতলার একটি ঘরে গিয়ে আটজনকেই দেখতে পেলাম। তারমধ্যে মফিদুল ভাই ও নূর ভাইর সঙ্গে বেশী দেখা হয়, অন্যদের সঙ্গে আন্দোলনের কর্মসূচিতে। তাঁরা আমাকে বিস্তারিত জানালেন এবং জাদুঘরের কর্মকাণ্ডে আগ্রহী তরুণ সংস্কৃতিকর্মীদের সম্পৃক্ত করতে বললেন। আমি পুরো বিষয়টা বুঝেছিলাম।

ইতোমধ্যে স্রোত আবৃত্তি সংসদের সঙ্গে শহীদদের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান 'আমরা তোমাদের ভুলবোনা' নির্দেশনা ও গ্রন্থনার কাজ করেছি, প্রজন্ম '৭১ গঠন ও কর্মকাণ্ডে সক্রিয় সহযোগিতা করেছি। ফলে তরুণরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়ে কতটা আলোড়িত ও উদ্দীপ্ত হবে তা ধারনা করতে পারছিলাম। মনে পড়ে যেখানে যাদেরকেই বলি সব হৈহৈ করে ওঠে। ওদের চোখের মধ্যে আমি একটা নতুন স্বপ্ন দেখতে পাই। যা আমার হৃদয়েও আঁকা হয়ে গেছে। দলবেঁধে ছেলেমেয়েরা ৫ সেগুনবাগিচায় গিয়ে কতৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাত করেছে। আবৃত্তিশিল্পী রফিকুল ইসলাম, নাসির এই দু'জনকে গ্রামের বাড়ি থেকে খবর দিয়ে এনেছিলাম। আমেনা হাত ধরে অশ্রুসীক্ত চোখে বলেছিল 'আমি জাদুঘরে কাজ করতে চাই'। শহীদ সন্তান সোহাগ বলেছিল, কোন অর্থের প্রয়োজন নেই যতদিন পারবো কাজ করতে চাই। আরো কত প্রিয় মুখ সেই কাজে যোগ দিল।

২/৩টি শহীদ পরিবার মুক্তিযুদ্ধের স্মারক প্রদানের সময় ট্রাস্টিদের সঙ্গে আমাকেও থাকতে বলেছিলেন। আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করায় বলে ছিলেন, 'আপনি আমাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে থাকবেন'। এমন স্মৃতি আজও একান্তে অশ্রুজলে আমার বুক ভেজায়।মুক্তিযাদ্ধ জাদুঘরের উদ্বোধনী দিনে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে মূলফটকের সামনে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। জাতীয় সঙ্গীতের প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনায় আমি শিহরিত হলাম। তারপর থেকে কারণে অকারণে ৫ সেগুনবাগিচা আমাদের প্রাণের ঠিকানা হয়ে উঠলো। প্রতি বছর বেশ কিছু জাতীয় দিবসে অংশগ্রহণ ছাড়াও কিছু বিশেষ ভাবনার কাজ করেছি মফিদুল ভাইয়ের পরামর্শে। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রান্তিক অঞ্চলের কেউ ঢাকায় এলে মুক্তিযাদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে তা জানিয়েছি। ২০০১-২০০৬ এই সময়ে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গনে করেছি। পরিসর খুব একটা বড় না হলেও চেতনার গভীরতা অনুভূত হতো সবার হৃদয়ে। শিশুদের সংগৃহিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি- যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিয়মিত কার্যক্রম। মফিদুল ভাইয়ের অনুরোধে তা নিয়ে আমি স্রোত আবৃত্তি সংসদে একটি অনুষ্ঠানের গ্রন্থনা ও নির্দেশনার কাজ করেছিলাম । প্রযোজনাটির নাম ছিল 'মুক্তিযুদ্ধ রূপকথা নয়'। ভিন্নমাত্রায় মুক্তিযুদ্ধকে অনুধাবন করেছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মানুষের ভালোবাসা ও অর্থায়নে আজ বহুতল বিশিষ্ট ভবন। শৈল্পিক ও নান্দনিক ভাষায় মুক্তিযুদ্ধকেই মূর্ত করে তুলেছে। চোখ জুড়ায়, মন জুড়ায়। তবু প্রাণ কাঁদে সেই ৫ সেগুনবাগিচার পুরানো বাড়ির জন্যে।

প্রকৃতির এক নিষ্ঠুর নিয়মে সংঘ ভেঙে যায়। এক স্বপ্ন আর একই অঙ্গীকার নিয়ে যূথবদ্ধ পথ চলা হয় না। যতদিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থাকবে ততদিন আমাদের চেতনায় ভাস্বর হয়ে থাকবেন আটজন দেশপ্রেমিক। যাঁরা আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে মুক্তিযুদ্ধকে প্রজন্মের কাছে মূর্ত করে ধরার এই অসামান্য কাজ সম্পাদন করেছেন। এখনো অনেক কাজ বাকি। যা আটজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে নিতে পারবেন না। ২০১৯-২০২০ না ফেরার জগতে চলে গেলেন সদাহাস্য কবি রবিউল হুসাইন যিনি স্নেহ ও প্রেরণা দিতে কখনো কার্পন্য করেননি, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী আমার অনুরোধে একা গাড়ি চালিয়ে ভোর আটটায় চট্টগ্রামে শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাতে গিয়েছিলেন। আলী যাকের ভগ্ন শরীরে চার ঘণ্টা আমার সঙ্গে জীবনের নানান পর্যায় নিয়ে অকপটে কথা বলেছিলেন।

তাঁরা প্রত্যেকেই দেশপ্রেমিক হিসেবে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। অফুরন্ত আগামী তাঁদের ত্যাগ ও অবদান গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে তাঁদের কাজের মধ্যদিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আটজনের ঐক্য অটুট রাখবে চিরদিন।

হাসান আরিফ

Forgotten No More

Statement on the Bangladesh Genocide

ইন্টারন্যাশনাল সাইটস অব কনসান্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। গত ২৪ মার্চ ২০২২ ইন্টারন্যাশনাল সাইটস অব কনসান্স জাতিসংঘের সাধারণপরিষদসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে বাংলাদেশের গণহত্যাকে স্বীকৃতি দানের আবেদন করে। আবেদন পত্রে গণহত্যা প্রতিরোধে এবং বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি পাবার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রমকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। আবেদনটি ২৫ মার্চ ২০২২ গণহত্যা দিবসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত সেমিনারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী র হাতে হস্তান্তর করেন কোয়ালিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

International Coalition of SITES of CONSCIENCE

memory to action

New York, New York

March 24, 2022

Forgotten No More Statement on the Bangladesh Genocide

On the 50th anniversary of the liberation of Bangladesh, the International Coalition of Sites of Conscience stands with its founding member, the Liberation War Museum, in calling on the United Nations General Assembly and other international entities to formally recognize the Bangladesh genocide of 1971 – one of the darkest, yet most overlooked chapters in human history.

The genocide, a brutal campaign by Pakistan to suppress the Bengali independence movement, was carried out over a nine-month period. Millions of Bengalis were displaced to India and at least 200,000 were victims of sexual violence. While the reported numbers of those who died in the genocide varies there is no doubt that it took a huge toll in terms of death. Those who were targeted are also not in dispute. Bengalis, Hindus, intellectuals, artists, doctors, lawyers, students and others supporting independence.

Despite ample evidence of torture and extermination, the lack of formal international recognition of the Bangladesh Genocide has meant that – fifty years later – no Pakistan war criminals have faced prosecution. This lack of accountability undermines human rights for all and is particularly painful for Bengalis. Not only are they denied justice, but a central component of their history is being erased, making closure and more peaceful futures out of reach.

In the face of this challenge, the Liberation War Museum has worked tirelessly for decades to raise global awareness of the genocide and honor its victims through a variety of platforms, including memorials at the sites of mass killings and the establishment a national museum dedicated to the genocide and its legacies. The museum's long history of engaging young people across Bangladesh through the collection of oral histories, mobile exhibits, cultural performances and other means ensure that younger generations will remember this history and its crucial lessons that must never be forgotten. Additionally, in 2014 the museum established the Center for the Study of Genocide and Justice, which promotes research, documentation and education on genocide, as well as commemorates its victims.

The 50th anniversary of the liberation calls for all institutions and individuals concerned with justice and human rights to officially recognize the Bangladesh Genocide and its profound impact on Bengalis past and present. It is only through confronting the past with honesty and courage that we can acknowledge our shared humanity and truly flourish.

The International Coalition of Sites of Conscience

International Coalition of Sites of Conscience
New York, USA
March 24, 2022

On the 50th anniversary of the liberation of Bangladesh, The International Coalition of Sites of Conscience stands with its founding member, The Liberation War Museum, in calling on the United Nations General Assembly and other international entities to formally recognize the Bangladesh Genocide of 1971 - one of the darkest, yet most overlooked chapters in human history.

The genocide, a brutal campaign by Pakistan to suppress the Bengali Independence movement, was carried out over s nine-month period . Millions of Bengalis were displaced to India and at least 200,000 were victim of sexual violence. while the reported number of those who died in the genocide varies there is no doubt that it took a huge toll in terms of death. Those who were targeted are also not in dispute : Bengalis, Hindus, intellectuals, artists, doctors, lawyers. students and others supporting independence.

Despite ample evidence of torture and extermination, the lack of formal international recognition of the Bangladesh Genocide has meant that - fifty years later - no Pakistan war criminals have faced prosecution. This lack of accountability undermines human rights for all and is particularly painful for Bengalis. Not only are they denied justice, but a central component of their history is being erased, making closure and more peaceful futures out of reach.

In the face of this challenge, the Liberation War Museum has worked tirelessly for decades to raise global awareness of the genocide and honor its victims through a variety of platforms, including memorials at the sites of mass killings and the establishment a national museum dedicated to the genocide and its legacies. The museum's long history of engaging young people across Bangladesh through the collection of oral histories , mobile exhibits, cultural performances and other means ensure that younger generations will remember this history and its crucial lessons that must never be forgotten. Additionally, in 2014 the museum established the centre for the Study of Genocide and Justice, which promotes research, documentation and education on Genocide, as well as commemorates its victims

The 50th anniversary of the liberation calls for all institutions and individuals concerned with justice and human rights to officially recognize the Bangladesh Genocide and its profound impact on Bengalis Past and present. It is only through confronting the past with honesty and courage that we can acknowledge our shared humanity and truly flourish.

নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে

বাংলাদেশে নবনিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস গত ৩ এপ্রিল, রবিবার সকালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ও কর্মকর্তাবৃন্দ তাকে জাদুঘর প্রাঙ্গণে স্বাগত জানান। তিনি একাত্তরের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শিখা চির অম্লানে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। ট্রাস্টি মফিদুল হক তাকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন এবং গ্যালারী পরিদর্শন করান। পরিদর্শন শেষে তিনি পিটার ডি হাস যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার বন্ধুত্বের প্রত্যয় পূর্নব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য এ বছরের ৪ এপ্রিল বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি হয়েছে।

আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে টিম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে অনুদান প্রদান

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: মোজাম্মেল হক একাত্তরে দেশকে স্বাধীন করেছেন। এখন তাঁর চাওয়া বর্তমান প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধকে নিজেদের ভেতর ধারণ করে। তিনি নিজে যুক্ত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে অর্থ সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে। সম্প্রতি তিনি তার পুত্র মো: মনছুরুল হকের নামে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দশ হাজার টাকা প্রদান করেন। তার চাওয়া পুত্র যেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে আত্মিকভাবে সম্পৃক্ত থাকে।

বিশিষ্ট গণসঙ্গীত শিল্পী ইকবাল আহমেদ ২০২২ সালে একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন। তিনি একুশে পদক থেকে প্রাপ্ত অর্থের দুই লক্ষ টাকা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে অনুদান হিসেবে প্রদান করেছেন।

২৫ মার্চ ২০২০ Conflict and Resilience Research Institute Canada এবং বঙ্গবন্ধু সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর যৌথ আয়োজনে আয়োজিত হয় ওয়েবিনার 1952-1971 Bangladesh Eenocide : A Tale of Gross Human Rights Violation. ১৯৫২-১৯৭১ পর্যন্ত বাঙালি জাতি সামগ্রিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছিলো পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা সে প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক।

বাংলাদেশ দূতাবাস, নেদারল্যান্ডের আয়োজনে ওয়েবিনার

গণহত্যা : আমরা যেন ভুলে না যাই

২৫ মার্চ ২০২২ বাংলাদেশ গণহত্যা দিবস স্মরণে নেদারল্যান্ডের হেগে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজন করে 'গণহত্যা আমরা যেন ভুলে না যাই' শিরোনামে বিশেষ ওয়েবিনার। রাষ্ট্রদূত রিয়াজ হামিদুল্লাহর পরিচালনায় ওয়েবিনারে বাংলাদেশ, মিয়ানমার, রুয়ান্ডা ও বসনিয়ার গণহত্যা নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন রুয়ান্ডার রাষ্ট্রদূত অলিভিয়ের জেন প্যাট্রিক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, বার্মিজ রোহিঙ্গা সংস্থার সভাপতি তুনখিন, সারাজেভোর মিউজিয়াম অফ ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি এন্ড জেনোসাইড-এর সেনাদ কাদরিচ। মফিদুল হক বাংলাদেশ গণহত্যা প্রসঙ্গে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে একাত্তরে সংঘটিত গণহত্যা বিস্মৃতি ও অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে গেছে, বর্তমানে এবিষয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি হচ্ছে। নতুন প্রজন্ম সম্পৃক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ গণহত্যাকে বিশ্বে তুলে ধরতে এবং ভবিষ্যত গণহত্যা প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরি করতে।

২৬ বছর পূরণ করলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সবদেশেই জাতীয়তাবাদ কম-বেশি থাকে। কোনোটা বেশিভালো, কোনোটা কম ভালো, কিন্তু আমাদের জাতীয়তাবাদ হচ্ছে খুব প্রাউড ন্যাশনালিজম। এই প্রাউড ন্যাশনালিজমটা কী? আমরা আমাদের গান নিয়ে, কবিতা নিয়ে, আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে, আমাদের কৃষ্টি নিয়ে আমরা খুব গর্বিত।

আবার ১৯৭২ সালের সংবিধান ও একটা বড় যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে তিনি মনেকরেন। সংবিধান কোনো ধার করা বুলি নয়, কপি করা স্লোগান নয়। এখানে কতগুলো ধারা উপধারা সংযোজিত হয়েছে। যেটা আমাদের নিজেদের উদ্ভাবন। তিনি দুটো ধারার উদাহরণ দেন। অনেকের ধারনা যে, আমাদের ৭২-এর সংবিধানে যে সমাজমুখী মানসিকতা বা যাকে আমরা সমতামুখী আকাঙ্খা বলি, সেটা বোধ করি ভারতীয় সংবিধান থেকে এসেছে। যেহেতু সংবিধান প্রণেতারা অনেকগুলো সংবিধান কনসাল্টেশন করেছিলেন ব্রিটিশ, আমেরিকান, ফ্রেন্স, রাশিয়ান, যুগোস্লাভিয়ান, পোল্যান্ড, চাইনিজ, ভারত। সুতরাং এখানে ওখান থেকেই কোথাও এসেছে। কিন্তু ভারতের প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, সংবিধানের দুটো ধারা সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, এই দুটি ধারা ভারতে সংযোজিত হয় ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে। আর বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে সেই ধারা সংযোজিত করেছিলো। আর সমাজতন্ত্রের ধারনাটা আমরা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে স্পষ্ট উল্লেখিত দেখতে পাই। ১৯৬৪ সালে পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগের সংবিধানেও সেটা আমরা দেখতে পাই। আর ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটা আরো পরে এসছে, ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু অসাম্প্রদায়িকতা এই শব্দটা এসেছে। আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে, বিশেষত তৎকালীন প্রধান দল আওয়ামী লীগের নানা পর্যায়ে সংগঠনের প্রকাশনায়।

তারমতে সুযোগের সমতা বলে যে শব্দটা এখন আমরা শুনি এসডিজি ও এমডিজির ক্ষেত্রে, এই কথাটা ৭২-এর সংবিধানেই ১৮ এবং ১৯ ধারায় বিস্তৃতভাবে বয়ান করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন বিহারের একজন ইকোনোমিস্ট তাকে বলেছিলেন, তোমাদের দেশ মুক্তিযুদ্ধের কারণে অনেক বেশি জনসম্পৃক্ত বা সমাজ সচেতন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোক বা মুক্তিযুদ্ধ দ্বারা সরাসরি উদ্বুদ্ধ হোক একটি বড় অংশ জনহিতকর কাজে ঝাপিয়ে পড়ে। এমনকি ৭২-৭৫ পর্বের যেসব এনজিও ছিলো সেগুলো মূলত ছিলো হিউমেরেটিয়ান কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এভাবে তিনি বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সূচকের মানদণ্ড বৃদ্ধিতে মুক্তিযুদ্ধের অবদান ব্যাখ্যা করেন।

আয়েজন শেষ হয় স্পন্দন এর শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশন এবং ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস এর শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

মুক্তির পতাকা হাতে অদম্য পদযাত্রা

সূচনা বোধ করি একাত্তরেই, যখন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হাতে একদল তরুণ সীমান্ত থেকে দিল্লি পৌঁছবার পদযাত্রা শুরু করেছিলেন বিশ্ববিবেক জাগ্রত করার লক্ষ্য নিয়ে। তারপর মুক্তিযুদ্ধের অজস্র ঘটনার মতো এই অনন্য পদযাত্রার কাহিনিও তলিয়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির অতলে। অনেক বছর পরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী সাক্ষাৎ পায় পদযাত্রীদের, তাঁরা শোনান তাঁদের অভিযানের কথা, জাদুঘরের কাছে তুলে দেন কিছু ছবি ও প্রামাণ্য দলিল। সেই সুবাদে একে একে অভিযাত্রীদলের আরো অনেকের কথা জানা যায়, তাঁরা সমবেত হন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে, তাঁদের নিয়ে আয়োজিত হয় অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী এবং অনেকে জানতে পারেন বিস্মৃত সেই ঘটনা।

দূর অতীতে একাত্তরের তরুণদের সম্মিলিত অভিযাত্রা আজকের তরুণদের মধ্যেও ভিন্নতর অনুরণন জাগায়। এরই অসাধারণ প্রকাশ ঘটে পর্বতারোহী ও অভিযানপ্রিয় নবীন-নবীনাদের মধ্যে, ২০১৩ সালে তারা আয়োজন করে অভিনব আরেক পদযাত্রার, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের সূর্যোদয়ের লগ্নে শহীদ মিনার থেকে হাঁটতে শুরু করে সূর্যাস্তের সময় তারা পৌঁছায় সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে, জাতির জাগরণ ও আত্মদানের বিভিন্ন স্মৃতিপীঠ স্পর্শ ইতিহাসের পথ বেয়ে তারা এগিয়ে যায় অভীষ্ট লক্ষ্যে। ২০১৬ সাল থেকে অভিযাত্রীদল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে করে নেয় অদম্য পদযাত্রার অংশী। ক্রমে বাড়তে থাকে পদযাত্রার কলেবর ও বিস্তার। অভিযাত্রীদলের যে ঘোষণা, পদযাত্রার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের বাস্তবতা তারা অনুভব করবে, কালের ব্যবধান অতিক্রম করে মানুষের অবদান ও আত্মদান তারা অন্তরে ধারণ করবে, সেই বার্তা সাড়া জাগায় আরো অনেক মনে। এই প্রত্যয়ী যাত্রা ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে পৌঁছে সাভারে একাত্তরের আত্মদানের জাতীয় প্রতীকে। তবে বাংলাদেশ জুড়েই তো রয়েছে জাতির আত্মোপলব্ধি ও আত্মদানের বিভিন্ন স্মারকপীঠ। সেই পথ

বেয়ে আয়োজিত হতে পারে এমনি আরো অনেক পদযাত্রা।

অভিযাত্রীদলের উদ্যোগ ও আবেদনে রয়েছে যে সৌন্দর্য ও শক্তি তার পরিচয় মেলে ধরতে প্রকাশিত হলো এই বিশেষ ক্রোড়পত্র। অদম্য পদযাত্রার আহ্বান ছড়িয়ে পড়ুক এক থেকে অনেকে, প্রতি বছর ফিরে ফিরে আয়োজিত পদযাত্রা অর্জন করুক আরো বিস্তার এই আমাদের প্রত্যাশা।

বর্তমান ক্রোড়পত্র বহন করছে ২০২২ সালের অদম্য পদযাত্রার বিভিন্ন বিবরণ ও ছবি, পদযাত্রীদল যা রচনা করেছে। অভিযাত্রীদের জন্য রইলো আমাদের শুভকামনা ও ভালোবাসা।

মফিদুল হক
ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

উচ্ছ্বাস আর অপূর্ণতা

মির্জা জাকারিয়া বেগ

প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে যতটা উচ্ছ্বাসিত হই ঠিক ততটাই হয়ে উঠি বিহ্বল। বছর শুরুর দিনটাই আরও একটি স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের বার্তা নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু ২৬ মার্চ যত ঘনিয়ে আসে অপারগতা আর অপূর্ণতার মাত্রা বাড়তে থাকে ততটাই। এমনি করেই দশটি বছর স্বাধীনতা দিবসে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত 'শোক থেকে শক্তি:অদম্য পদযাত্রা নামে পায়ে হাঁটা কর্মসূচি পালন করতে পেরে উচ্ছ্বসিত।

বিগত দশ বছরে ঢাকার পাশাপাশি বিভিন্ন বছরে মুজিবনগর, জামালপুর, পাবনার ভাঙ্গুড়া- ফরিদপুর, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর এবং লালমনিরহাটের হাতিবান্ধায় শোক থেকে শক্তি: অদম্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের।

আমরা গর্ববোধ করি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তহবিল গঠনে সামান্য হলেও এই পদযাত্রার মাধ্যমে অবদান রাখায়। সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই আয়োজনের অংশ হওয়ায় শোক থেকে শক্তি: অদম্য পদযাত্রা পেয়েছে নবতর মাত্রা।

স্বাধীনতার পথরেখায় পদযাত্রা করতে গিয়ে আমরা শহীদ মিনার থেকে কখনো জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল, ডাকসু ভবন, স্মৃতি চিরন্তন, জহুরুল হক হল, কখনো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিখা চিরন্তন, ধানমন্ডি ৩২, আসাদ গেট, স্বাধীনতা টাওয়ার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, এসওএস শিশু পল্লী, মিরপুরের জল্লাদ খানা বধ্যভূমি, বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, অথবা রায়ের বাজার বধ্যভূমি হয়ে এগিয়ে গেছি। এবারে ঢাকা মেডিকেলের ঐতিহাসিক আমতলা গেট, শহিদ ডা. ফজলে রব্বী হল, কিংবা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার সেলের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিনের সেই শোকাবহ স্মৃতি অনুধাবন করতে গিয়ে অনেকেই হয়েছেন বাকরুদ্ধ। সেই সাথে এইসব স্মৃতিবিজড়িত স্থানের জীবন্ত ইতিহাস তুলে ধরে আমাদের উজ্জিবিত করতে কাক ডাকা ভোর হতে চৈত্রের তাপদাহ উপেক্ষা করে বিভিন্ন সময় পদযাত্রায় শামিল হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা বীর উত্তম কমল সিদ্দিকী, শিক্ষাবিদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক ইয়াসমিন হক, চলচ্চিত্রকার মসিহউদ্দিন শাকের, জাদুঘরের ট্রাস্টি সারা যাকের, মফিদুল হক, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, সারোয়ার আলী, রবিউল হুসাইন, উত্তর মেরু অভিযাত্রী ইনাম আল হক, পর্বতারোহী এমএ মুহিত, বিশ্ব পর্যটক তারেক অনু, শিক্ষাবিদ হেনা সুলতানা, ডা. জেবুন্নেসা, কিশোর মুক্তিযোদ্ধা মোহসীন হোসেন, তরুপল্লবের বৃক্ষ-প্রেমিক ইমাম হোসেন গাজী, ছায়ানটের লাইসা ইসলাম লিসা, মাজেদা হকসহ অনেকেই।

মাজেদা হক আমাদের মাঝে নেই। সেই সাথে আমরা হারিয়েছি আমাদের স্বপ্ন দেখানো জিয়াউদ্দিন তারিক আলী ও রবিউল হুসাইনকে। মাজেদা হকের স্বপ্ন ছিলো স্বাধীনতার পথ বেয়ে অভিযাত্রীরা যখন হেঁটে যাবে তখন পথের পাশে স্থানীয় মানুষেরা তাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন মুড়ি, চিড়া, গুড় কিংবা জলের কলস নিয়ে সেদিনের মতই এই প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধের আপ্যায়নে। মাজেদা হকের কথা মনে হতেই এক অপার অপূর্ণতায় আচ্ছন্ন হয় অভিযাত্রীর মন।

২০১৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমাদের আগ্রহ, অভিযাত্রী ইনাম আল হক এই প্রজন্মের অভিযাত্রীদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, আজকের এই পদযাত্রা একদিন লক্ষ

১৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

অদম্য পদযাত্রা ২০২২

১৯৭১ সালে একদল অভিযাত্রী দেশমাতার মুক্তির অভিপ্রায়ে 'বিশ্ব-বিবেক জাগরণ পদযাত্রা'য় হেঁটে অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বর্তমান প্রজন্মের আরেক দল অভিযাত্রী গত ১০ বছর ধরে শহীদ মিনার থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত পদযাত্রা করে আসছে।

২০১৩ সালে স্বাধীনতার বিয়াল্লিশ বছরে বিয়াল্লিশ কিলোমিটার পথ হেঁটে একাত্তরের উত্তাল দিনগুলো স্মরণ করে অভিযাত্রী। ফিরে তাকায় বায়ান্ন থেকে পাড়ি দিয়ে আসা গৌরবের পথরেখার দিকেও। বাংলার স্বাধীনতা ও স্বাধীকার আন্দোলনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান স্পর্শ করে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত হেঁটে যায়। এই পায়ে হাঁটা কর্মসূচিতে ২০১৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যুক্ত হওয়ায় পদযাত্রা পায় এক নবতর মাত্রা। সেবার পদযাত্রাটি নিবেদিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেই থেকে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ সর্বস্তরের মানুষ এতে যুক্ত হয়েছে। ২০১৮ সালে মেহেরপুরে, ২০১৯ সালে জামালপুরে এবং ২০২১ সালে পাবনার ভাঙ্গুড়া ও মৌলভী বাজারে হয়েছে এই পদযাত্রা। গতবছর সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসেও পদযাত্রা করেছেন এক অভিযাত্রী।

২৬ মার্চের প্রত্যুষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে ভারতেশ্বরী হোমসের শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে জাতীয় সঙ্গীতের সমবেত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় এবছরের আয়োজন। স্বাধীন বাংলার পতাকা হাতে শহীদ আসাদের স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আমতলা গেটের সামনে যায় অভিযাত্রী দল। সেই স্মৃতিধন্য স্থান ছুঁয়ে পদযাত্রা যায় পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে। এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে হোসেনী দালান সড়ক ধরে বকশী বাজার মোড় হয়ে শহীদ ডা. ফজলে রাব্বি হলের সামনে দাঁড়িয়ে ড. জাফর ইকবাল শোনান, ডা. ফজলে রব্বী ছিলেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। আল-বদর সদস্যরা তাঁকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। হল পেরিয়ে বুয়েট প্রধান ফটক সংলগ্ন শহীদ মিনারের সামনে যায় পদযাত্রী দল । পলাশীর মোড়ে অবস্থিত ভাষা

শহীদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘরের সামনে দিয়ে ইডেন কলেজ পেরিয়ে নিউমার্কেট হয়ে ধানমন্ডি ৩২ হয়ে এবারের গন্তব্য আসাদ গেইট ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নির্মিত মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার পেরিয়ে পদযাত্রী দল পৌঁছে আগারগাঁও-এ অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। সেখানে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বরন করে নেয় পদযাত্রীদের। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হকের সাথে উপস্থিত ছিলেন একাত্তরের বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রী কামরুল আমান। তিনি পদযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের দেখে আমি অনুপ্রানিত হচ্ছি। প্রতি বছর আমি এখানে আসতে চাই। এরপর যুক্ত হয় যুক্ত হয় ব্রতচারী দল, তাদের ঢালি নৃত্য পরিবেশনায় উদ্দীপ্ত হয় অভিযাত্রীরা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে বেরিয়ে এসওএস শিশুপল্লী, টেকনিক্যাল মোড়, মাজার রোড হয়ে পদযাত্রা যায় মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে। সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন ও নীরবতা পালন শেষে দিয়াবাড়ি ঘাটে অপেক্ষমাণ নৌকায় শুরু হয় পদযাত্রীদের জলযাত্রা। দুপুর না গড়াতেই পদযাত্রীদল পৌঁছে যায় সাদুল্লাপুরের শতবর্ষী বটমূলে, দেশমাতার -শীতল ছায়াময় আঁচলতলে।

বেগুনবাড়ি স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকের মিলিত ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে পদযাত্রীদল পৌঁছে যায় আক্রান স্কুল প্রাঙ্গণে। এখানে বিশ্রাম। ততক্ষণে বেলা গড়িয়ে বিকেল। এই সময়ে পদযাত্রী দল চলে যায় মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিকামী বাঙালির সম্মুখযুদ্ধের স্মৃতি ঘেরা কলমা গ্রামের ছায়াময় মেঠো পথ ধরে সাভার ডেইরিফার্ম। ঢাকা আরিচা মহাসড়কের ডেইরিফার্ম গেট সংলগ্ন শহীদ টিটো'র সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে জানায় বিনম্র শ্রদ্ধা। অসম সমরে পাকিস্তানি বাহিনীকে নাজেহাল করা অমিত-তেজ তরুণ টিটো'র বীরত্ব গাঁথায় উজ্জীবিত পদযাত্রী দল। এবারের যাত্রা ঢাকা আরিচা মহাসড়ক ধরে, দৃষ্টিপথে জেগে উঠবে শক্তির সেই উজ্জ্বল শিখর: জাতীয় স্মৃতিসৌধ। জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে নতশিরে শ্রদ্ধা জানানো জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। আর গভীর ভালবাসায় উচ্চারণ হলো তারুণ্যের দৃপ্ত শপথ। এবছর ঢাকার পদযাত্রা পুরো ৩২ কি.মি. শেষ করেছেন ১৫২ জন পদযাত্রী। ভারতেশ্বরী হোমস এবং সোহাগ স্বপ্নধারার কিছু শিক্ষার্থীরা এবছর সরাসরি পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। এই পদযাত্রার কলেবর বাড়তে বাড়তে একদিন মহাসমুদ্রে পরিণত হবে এটাই অভিযাত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশ্বাস করে।

মো: ইমাম হোসেন

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলা থেকে সাঁথিয়া উপজেলায় বাউসগাড়ী গণকবর

'১৯৭১ সালের ১০ই মে, সোমবার। সকালে স্কুলে এসে দেখি, প্রধান শিক্ষকের রুমে তিনজন লোক বসে। একজনকে চিনলাম, পাক-হানাদারদের দোসর, আসাদ, আসাদ দালাল। আরেক জনের পরিচয় পেলাম একটু পরেই- মতিউর রহমান নিজামী।' একাত্তরের গণহত্যার ভয়াল স্মৃতি তুলে আনলেন সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী জনাব আইনুল হক। স্বাধীনতার পথরেখায় পদযাত্রা শুরু হল আমাদের, ভাঙ্গুড়া উপজেলার শহীদ মিনার থেকে ডেমরা-সাঁথিয়ার সীমান্তবর্তী সাঁথিয়া উপজেলার বাউসগাড়ী গণকবরে। ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান জনাব রফিকুল ইসলাম এসেছেন সবার আগে, সঙ্গে স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে প্রায় ২৫ জন। এর পরপরই এলেন ভাঙ্গুড়া জরিনা রহিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মিলে প্রায় ৪০ জনের দল। পতাকা হাতে, আগের মতই, সবার সামনে সহকারি প্রধান শিক্ষক মোঃ মেহেদী হাসান। প্রায় একই সঙ্গে এলেন অন্যান্য কিছু স্কুলের শিক্ষক এবং অবশ্যই বর্ষীয়ান মুক্তিযোদ্ধা খালেক বয়াতি।

শহীদ মিনারের সমবেত সবাই। সংক্ষেপে জানানো হলো পদযাত্রার ইতিহাস আর গভীর আবেগে উচ্চারিত হলো, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' রেল ব্রিজের নিচ দিয়ে পথ, পার হয়ে থামলাম এখানে। অদূরে রেললাইন, এখানেই থেমেছিল ট্রেন ১৯৭১-এর ২৩ মে রাতে, গণহত্যার উদ্দেশ্যে, ফরিদপুর উপজেলার হাদল গ্রামে। খালেক বয়াতি শুরু করলেন দেশাত্মবোধক গান, কালের স্রোত পেরিয়ে সে গান কী পৌঁছালো পাক হানাদারদের কানে! বর্ষিয়ান এবং অসুস্থ শিক্ষকরা বিদায় নিলেন এখান থেকে, দুঃখ করলেন, শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে আর একটু সঙ্গে না থাকতে পারায়; যাবার আগে আশীর্বাদ করে গেলেন সকল শিক্ষার্থীকে। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ভেড়ামারা উদয়ন একাডেমী, প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে। স্কুল আর কলেজের ছেলেরা আগেই বলে রেখেছে পুরো পথ হাঁটবে ওরা, মেয়েরাও। তবুও জিজ্ঞেস করলাম আরেকবার, 'বাবারা, আম্মুরা, কত পথ থাকবে সাথে?'

'কেন', অবাক হলো সবাই, 'পুরো পথ!'

'পুরো পথ? ২০ কিলোমিটারের বেশি কিন্তু।'

'তো?'

'তবে আজকে যে ২০ কিলোমিটার হাঁটতে চাইছো কোন সাহসে?'

'মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করতে দিনের-পর-দিন কত এমন হেঁটেছে, আর আজকে একদিন আমরা পারব না? অবশ্যই পারবো।' এই পরম প্রাপ্তিতে ভরে গেল হৃদয়! তোমাদের হাত ধরেই এগিয়ে যাবে দেশ। দ্রুতই হাঁটছি আমরা, সেই পথ ধরে যে পথ দিয়ে একদিন পাকহানাদার বাহিনী গিয়েছিল হাদল গণহত্যায়। আজ বিজয়ীর বেশে আবারও যাচ্ছি সে পথ দিয়ে, লাল-সবুজ পতাকা উড়িয়ে। সকাল আটটার দিকে পৌঁছালাম ভেড়ামারা উদয়ন একাডেমীতে। বেতের ধামায় গুড়-মুড়ি আর মাটির কলসিতে পানির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন প্রধান শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের অনেকেই না খেয়ে চলে এসেছে সাত সকালে। সামান্য কিছুটা হলেও ক্ষুধা মিটলো ওদের। এখান থেকে যুক্ত হলো সবুজ-শাদা পোশাকে স্কুলের প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী। ওদেরকেও জানানো হলো এই পদযাত্রায় উদ্দেশ্য। পরবর্তী গন্তব্য বেড় হাউলিয়ার ফরিদপুর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে। ডানে চলে গেছে হাদলের পথ, দীর্ঘশ্বাস ফেলে একবার তাকালাম সেদিকে, তারপর আকাশে উড়তে থাকা লাল-সবুজ পতাকার দিকে। এক সারিতে হাঁটছি আমরা, ৩০০ জনের ওপরে হবে। মানুষের বিস্মিত প্রশ্ন আর পদযাত্রার কারণ জেনে সস্নেহ দৃষ্টি আমাদের পাথেয়। পদযাত্রার সারিতে হঠাৎ দেখি ব্যাটারি চালিত যানে বসে এক কিশোর, নাম জানলাম, চাঁদ বাবু, হাঁটুর ওপর থেকে পা দুটি নেই, তবু

যুক্ত হয়েছে সে পদযাত্রায়! শোক থেকে শক্তি: অদম্য পদযাত্রা নামটি কি সার্থক হয়ে উঠলো এভাবেই! শিক্ষার্থীদের কলকাকলি আর দেশাত্মবোধক গানে মুখরিত পথ, এই আনন্দিত মুখগুলিই যেন বাংলার মুখ; এই মুখগুলি অমলিন থাক চিরদিন, এই প্রত্যাশা। সাড়ে নটার দিকে পৌঁছালাম বেড় হাউলিয়ার স্কুলে। এখান থেকে কিছুটা ম্লান মুখে বিদায় নিল ভেড়ামারা উদয়ন একাডেমীর শিক্ষার্থীরা, আজ তাদের অন্য কর্মসূচিতে অংশ নিতেই হবে বলে। 'উপায় থাকলে অবশ্যই থাকতাম এই অদম্য পদযাত্রায়, দুঃখ প্রকাশ করলেন প্রধান শিক্ষক, এমন আয়োজনে যুক্ত থাকতে পারাও সৌভাগ্যের বিষয়। পরবর্তী গন্তব্য প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে ফরিদপুর উপজেলা কার্যালয়। এটি ছিল পরিখা-বেষ্টিত চমৎকার একটি জমিদারবাড়ি, পরিচিত ছিল রাজবাড়ি নামে, এখন যা কেবলই স্মৃতিমাত্র। ঐতিহ্য কী এভাবেই মুছে যাবার! ফরিদপুর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে যুক্ত হলেন প্রধান শিক্ষক, আরো একজন শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানের প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী। মেরুন-শাদা পোশাকে যেন এক ঝাঁক পাখি! উৎসাহ-উদ্দীপনায় এরাও কম যায়না! যেন সহসা ছাড়া পাওয়া মুক্ত বিহঙ্গ, এখনই উড়ে যেতে চায় সুদূরে। ব্যস্ত রাস্তা ধরে হাঁটছি বলে সামলে রাখতে হচ্ছে সতর্কতার সঙ্গে। স্থানীয় সাংসদ, অগ্রজপ্রতিম মকবুল ভাই কিছুক্ষণ আগেই গাড়ি নিয়ে চলে গেছেন ফরিদপুর উপজেলায় প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করতে। ফিরতি পথে গাড়ি থামিয়ে ডাকলেন আমাকে, 'বাচ্চাদের বেশি দূর হাঁটিও না, ভীষণ গরম পড়েছে, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বিপদে পড়ে যাবে।' আশ্বস্ত করলাম ভাইকে, 'চিন্তা করবেন না, প্রত্যেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী থাকবে সঙ্গে।' ব্যস্ত বাজারের কৌতুহলী দৃষ্টি আর প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে উপজেলা কার্যালয়ে পৌঁছালাম। বেলা তেতে উঠেছে, সময় প্রায় এগারোটা। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম; খাবার এবং পানির আয়োজন নিজেদেরই। বাইরে বিস্তৃত মাঠে চলছে স্বাধীনতা দিবসের বিশাল কর্মসূচি। এখান থেকে ম্লান মুখে বিদায় নিল ফরিদপুর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, আরো দূরে যাওয়ার জন্য অভিভাবক কিংবা শিক্ষকের অনুমতি নেই বলে। খোলা চত্বরে গাছের ছায়ায় বসেছি সবাই, কেউ বা পাশের ছোট্ট খাবার দোকানটিতে। বিশ্রাম শেষে রওনা আবারও পথে নামে। উপজেলা কার্যালয় থেকে বেরিয়ে কিছুটা পথ গিয়ে মহাসড়ক, সেটি আড়াআড়িভাবে পার হয়ে নেমে গেলাম গ্রামের পথে। এ পথই টিয়ারপাড়া, মৃধাপাড়া হয়ে শাকপালা সড়ক দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরের বাউসগাড়ী গণকবরে। কিছুটা যাবার পর দেখি, সামান্য একটু বিপত্তি ঘটেছে- লাইনে সামান্য পিছিয়ে পড়েছিল কজন, তারা চলে গেছে কিছুটা এগিয়ে বিকল্প রাস্তার দিকে। মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনে এমন অবস্থা হলে কী হতো, ভেবে আঁতকে উঠলাম। মেয়েদেরকে রেখে পিছিয়ে পড়া দলকে নিয়ে এসে দেখি, মেয়েরা বসে আছে ছোটছোট টুলে, পাশে বাড়ির মহিলারা। শুনলাম, পদযাত্রার কথা শুনে ওনারা তাড়াতাড়ি আসন নিয়ে এসেছেন, নিজেরাই টিউবয়েল চেপে পানি তুলে হাত-মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করেছেন, আর দিয়েছেন ঘরে থাকা শুকনো কিছু খাবার ও পানি। একজন গাছ থেকে পেড়ে দিলেন একটি পাকা আতা। এ ভালোবাসা কোথায় রাখি!

গ্রামের পথে হাঁটছি, ক্রমশ কমে এলো ঘরবাড়ি, দু'পাশে এখন শুধুই দিগন্ত বিসারী ফসলের ক্ষেত- সবুজ কিংবা তামাটে। যেখানে পুরোপুরি বাঁক নিয়েছে রাস্তা, সেখানে বটের ছায়ায় বসলাম সবাই। ক্লান্ত কিছুটা, কিন্তু উচ্ছ্বলতা কমেনি একটুও ছেলে মেয়েদের। পাখিপ্রেমী জনাব ইনাম আল হক এতক্ষণ নিঃশব্দে চলেছেন আমাদের সঙ্গে, এখন কোথায় হারিয়ে গেছেন পাখির সন্ধানে। আর পাখিপ্রেমী অণু তারেকের সঙ্গে কথা বলছে ছেলে-মেয়েরা। নিত্যদিনের বাঁধন থেকে আজ বাইরে আসা ওদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখে মন ভরে উঠে। বাউসগাড়ী গণকবর আর ৪ কিলোমিটার। সূর্য মাথার ওপরে, পথ

কি কিছুটা দীর্ঘ মনে হচ্ছে! জুতো হাতে খালিপায়ে হাঁটছে কয়েকজন, পায়ে ফোসকা পড়ে গেছে; একটু যেন আরষ্ট একজনের পা। মোটর সাইকেল নিয়ে বাকি পথটুকু এগিয়ে দিতে চাইল পদযাত্রা এক সঙ্গী। 'এতদূর এসেছি যখন, বাকি পথটুকু হেঁটেই যাবো।' সামনেই বাউসগাড়ী গণকবর।

রুপসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থেমেছি আমরা। এর ঠিক উল্টো পাশেই রাজনৈতিক পোস্টারে আকীর্ণ নির্মাণাধীন রূপসী ঐতিহাসিক গণকবর 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ'। ঢোকার মুখে, একেবারে সামনে অত্যন্ত অমার্জিত ও দৃষ্টিকটুভাবে শ্বেতপাথরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী মুক্তিযোদ্ধার নাম ও আবক্ষ ছবি, যেন স্মৃতিসৌধটিই গৌণ এখানে। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ভাবলাম, "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ" কী বিপরীত ভাবেই না প্রকট হয়ে উঠেছে! বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জ্যোৎস্না রানী কর্মকার, আমাদের আসার কথা শুনে তার সাধ্যমতো এবং আমাদের প্রত্যাশার অতীত সামান্য আয়োজন করেছেন, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন বর্ষিয়ান, 'দৃপ্ত যুবক' প্রত্যক্ষদর্শী জনাব আইনুল হককে। গন্তব্যে পৌঁছে যেন একটু ক্লান্ত সবাই, সারাদিন পেটে তেমন কিছুই পড়েনি, অনেকের সকালের নাস্তাও হয়নি। তবে মেয়েদের উচ্ছ্বাস কমেনি একটুও, এ কী মুক্তির আনন্দ, হোক না সে একটি দিনের! ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান জনাব রফিকুল ইসলাম বের করলেন তার ঝাঁপি। ঝাঁপি থেকে একে একে বেরোলো ছোট্ট একটি

রেডিও, বাইনোকুলার, নোট বই, পানির পট, শুকনো খেজুর ও ছাতু; ঠিক যেন এক মুক্তিযোদ্ধার জিনিসপত্র। বেরোলো দুটো মাস্ক- শাদা আর কালো, যদি অন্যের মাধ্যমে বাড়ির স্বজনের কাছে খবর পাঠাতে হয়। সংবাদবাহকের শাদা মাস্কের অর্থ বেঁচে আছি, কালো মাস্কের অর্থ মারা গেছি যুদ্ধে। দুটো ক্যাপ- লাল-সবুজের অর্থ, ফিরছি বিজয়ীর বেশে, ধূসর ক্যাপের অর্থ পরাজিত। শেষ পর্যন্ত লাল-সবুজই উড়ছে, উড়বে আকাশে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে সেদিনের কথা শুনবো বলে স্কুলের দপ্তরে জমা হয়েছি সবাই। গভীর আবেগে সেদিনের কথা শোনালেন তিনি, '১০ই মে আসাদ দালাল আর নিজামী এসেছিল শান্তি কমিটি গঠন করতে। আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না বলে চলে আসি। পরে শুনেছি, কমিটি আর গঠন করা হয়নি।' 'ডেমরা জায়গাটি তখন প্রত্যন্ত অঞ্চল, ভাঙ্গা মাটির রাস্তায় কোনো রকমের সাইকেলে করে আসা যায়, নদীই যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। এ কারণে পাবনা জেলা ও আশপাশ থেকে বেশ কিছু হিন্দু পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল এখানে। ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার ডেমরা বাজারে যেয়ে কানাঘুষা শুনলাম, যে কোনদিন মিলিটারি আসতে পারে। তেমন গা করিনি এতে। ১৪ তারিখ শুক্রবার ফজরে উঠেছি, এমন সময় চিৎকার, চেঁচামেচির শব্দ। আমার এক মামা দৌড়ে এসে বললো, "মিলিটারি ঘিরে ফেলেছে গ্রাম, পালা শিগগির।" দুর্ভাগ্য, সেই মামা ধরা পড়ে গেল পাক হানাদার বাহিনীর হাতে। লুটপাট, আগুন লাগানো, ধর্ষণ সব চলেছে সেদিন। ধরে আনা মানুষগুলোকে সারি দিয়ে দাঁড় করিয়েছে ওরা; হিন্দুদের একপাশে, মুসলমানদের অন্যপাশে। তারপর সেজদা দেয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়াতে হুকুম দেয়, এর পরপরই গুলি। এর মধ্যে একজন কী করে যেন পালাতে পেরেছিল, তার কাছেই শোনা। আমরা দূরে থেকে শুধু গুলির আওয়াজ শুনেছি। ৩৫০ থেকে ৪০০ মানুষ মারা যায় ওখানেই, বিভিন্ন রিপোর্টে অবশ্য ৮০০ থেকে ৯০০ জনের মৃত্যুর কথা দেখেছি।' স্কুল থেকে বধ্যভূমি প্রায় ১০০ মিটার সামনে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ধুলায় ধুসরিত অস্থায়ী স্মৃতিসৌধ। পাশের ছোট্ট মুদি দোকানের মালিক আর সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী জনাব নূর মোহাম্মদ, দুজনে মিলে শোনালেন তাদের স্মৃতিকথা: 'মিলিটারি চলে যাবার পরে ফিরে আসি আমরা।' বলতে গিয়ে গলা যেন কেঁপে গেল তার, 'থইথই রক্তের মধ্যে শুধু লাশ আর লাশ! সেদিন কিছু করার ছিল না। শুক্রবার রাতে ঝেঁপে বৃষ্টি নামে, সকালে এসে দেখি সব রক্ত ধুয়ে গেছে; না হলে ওদের দাফন করা সম্ভব হতো না। মুসলমানদের লাশ চগো অর্থাৎ মই-এর ওপরে করে টেনে নিয়ে যাই ওই কবরস্থানে, 'খালের ওপারে কবরস্থানটি দেখালেন, 'ওটা পড়েছে ডেমরা ইউনিয়নে, ফরিদপুর উপজেলায়; ওখানেই গণকবর দেই লাশগুলোকে। কবরস্থানের ভেতরে-বাইরে কবর দেয়া হয়, কিছু জায়গা ভেঙে চলে গেছে খালে। আর হিন্দুদের লাশগুলো ওখানেই মাটিচাপা দেই,' স্মৃতিসৌধের পাশে রাস্তা বরাবর ছায়ায় ঢাকা জায়গাটিকে দেখালেন তিনি, 'মাটি খুঁড়লে এখনো হাড়গোড় পাওয়া যাবে।' শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনা শেষে অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো, এভাবেই 'ইসলাম রক্ষা'-র শেষে ফিরে গিয়েছিল পাকহানাদার বাহিনী। কবরস্থানে একটি নান্দনিক স্মৃতিসৌধ। মুকুলের গন্ধভরা আম গাছের ছায়ায় বসলাম সবাই; হাত মুষ্টিবদ্ধ, কণ্ঠে গভীর প্রত্যয়ে উচ্চারিত, 'হে আমাদের মহান অগ্রজেরা....।'

এবার ফেরার পালা। মূল সড়ক এখান থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার, বাহন বলতে হঠাৎ-পাওয়া ব্যাটারি চালিত ভ্যান। একটা খালি বালুরট্রাক দেখতে পেয়ে সাথে সাথে ওটাকে থামালো ছাত্ররা। ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে হুড়মুড় করে ট্রাকে উঠে বসলাম যতজন সম্ভব, বেশ কয়েকজনকে টেনে তুলতে হলো, একজনের জামা ছিড়ে গেল খোঁচা লেগে। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত এবং ভয়ানক ক্ষুধার্থ সবাই, বিশেষ করে স্কুলের ছেলেমেয়েরা। সকালের নাস্তাও হয়নি সবার, আর এ পর্যন্ত জুটেছে সামান্য কিছু গুড়, মুড়ি, বিস্কুট। ডেমরা বাজারে পাওয়া গেল শুধু জনা ছয়েক লোক বসতে পারে এমন একটি খাবার দোকান। এদিকে আমাদের দলে ৪৫ জন শিক্ষার্থীসহ প্রায় ৬০ জনের মতো। ফলে ২০ কিলোমিটার দূরের ভাঙ্গুড়া উপজেলাই এখন ভরসা।

'তাতে কী,' এটা শোনার পরেও ছেলেমেয়েদের উচ্ছ্বলতা একটুও কমে না, 'আজকে আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন, এই দিনের কথা জীবনেও ভুলবো না কখনো। মুক্তিযোদ্ধাদের কষ্ট বুঝেছি, ক্ষুধার কষ্ট বুঝেছি, ট্রাকে চড়ে শরণার্থীদের কষ্ট বুঝেছি; সবচেয়ে বড় কথা, যা কোনোদিনই ভাবিনি সম্ভব হবে আমাদের দিয়ে, সেটাই করে ফেলেছি আজকে মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে প্রেরণা পেয়ে। ইচ্ছে থাকলে সম্ভব, আজকে প্রমাণ করলাম। কথাটি মনের মধ্যে গেঁথে থাকবে সারা জীবন।'

মনে মনে ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বললাম, 'ভাই, কাউকে একটুও বেশি হাঁটাইনি, ওদের সামর্থ্যেই ওরা এসেছে এতদূর। আর আমরা ওদের অসীম সামর্থ্যকে বিচার করেছি আমাদের সীমিত আর বৈষয়িক মন দিয়ে। শুধু একটুখানি বিশ্বাস রাখি ওদের ওপর, একটুখানি সুযোগ পেলে অসম্ভবকে সম্ভব করবে ওরা, দেখবেন ওদের হাত ধরে কোন উচ্চতায় উঠে যায় দেশ, তার প্রমাণ তো দিলো ওরা আজকেই।'

বিদায়ের আগে পুরো পথ হাঁটা একজন ধর্মপ্রাণ শিক্ষককে জিজ্ঞেস করল এক অভিযাত্রি, 'ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পদযাত্রাকে কিভাবে দেখেন?'

'দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ, আর পদযাত্রা দেশপ্রেমের অঙ্গ।'

ডা. জাহিদ হাসান রঞ্জু

অদম্য পদযাত্রা- মৌলভীবাজার

শুরু হয়েছিল ২০২১-এ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নেটওয়ার্ক শিক্ষক মাধুরী মজুমদার মৌলভীবাজার জেলায় স্বাধীনতার ৫০-এর প্রতীকী হিসাবে পদযাত্রা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। মাধুরী মজুমদার দিদির সাথে পদযাত্রার বিষয় আলোচনা সময়ে জেনে নিই পদযাত্রা কোথা থেকে শুরু করে কোথায় শেষ করবেন। ঢাকায় ২০১৩ থেকে অভিযাত্রী 'শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা' আয়োজন করে আসছে এবং ২০১৬ থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পদযাত্রায় যুক্ত হয়। পদযাত্রা শুধু মাত্র হাটা নয়, এই পদযাত্রা কেন্দ্রিয় শহিদ মিনারে সমবেত জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিময় স্থান হয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ হয়। আলোচনা করে স্থির হলো বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী তাই পদযাত্রা বেরীরপাড় গণকবর হতে শুরু করে স্মৃতি বিজরিত পিটিআই বাংকার পর্যন্ত আয়োজন করলে নতুন প্রজন্ম একটি অজানা ইতিহাস জানতে পারবে। এভাবেই মৌলভীবাজার জেলায় 'শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা' যাত্রা শুরু।

দ্বিতীয়বারের মত এবারও মৌলভীবাজার গার্ল-গাইডস অ্যাসোসিয়েশন 'শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা' আয়োজন করে। এবারের পদযাত্রা একটু ব্যতিক্রম স্বাধীনতার ৫১ বছরের প্রতীকী হিসাবে ৫১ জন গার্ল-গাইডস অংশ গ্রহণ। পদযাত্রার মহাত্ম্য আরও বেড়ে যায় ১৯ মার্চ জাকারিয়া বেগ ভাইয়ের নেতৃত্বে সাত সদস্যের অভিযাত্রী দলের মৌলভীবাজার জেলা পরিক্রমণ। পদযাত্রার শুরুতে কিছুটা সংশয় ছিল, হবে তো ৫১ জন গার্ল-গাইড? কেননা প্রায় ভোর ছয়টা ছুঁইছুঁই এদিকে অভিযাত্রী গার্ল-গাইড মাত্র ৪০জন। অভিযাত্রী বন্ধু মাধুরী মজুমদার,গার্ল-গাইড শায়লা ও টিনা বিচলিত। এই দোটানা অবস্থার মধ্যে ঢাকা থেকে ইউসুফ ফোনে অবস্থান জেনে নিচ্ছেন আর জানালেন আমরা জাতীয় সংগীতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি চেষ্টাকরেন একত্রে জাতীয় সংগীত শুরু করা যায় কিনা? ভোর ছয়টা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ৪০ থেকে বেড়ে অভিযাত্রীর সংখ্যা ষাটের অধিক। জাতীয় সংগীত শুরুর পূর্ব মুহূর্তে শাহ হেলাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৫ গার্ল-গাইড এসে যুক্ত হলে সংখ্যা দাঁড়ালো ৭৫ জনে। যথারীতি ভোর ছয়টা দশে একযোগে ঢাকা কেন্দ্রিয় শহিদ মিনারের সমবেত জাতীয় সংগীতে অংশগ্রহণ। জাতীয় সংগীত পরিবেশন শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধাহত আব্দুল মোহিত টুটু-এর নেতৃত্বে পদযাত্রী দল বেরীরপাড় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ১৯৭১-এর শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জাগরণের গান গেয়ে শুরু হয় পদযাত্রা।

পদযাত্রী দলটি শাহ মোস্তফা সড়ক হয়ে লেইক রোড প্রবেশ মুখে হাফিজা খাতুন মিউনিসিপাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ঝাক শিক্ষার্থীসহ মৌলভীবাজার রানার ক্লাবের সদস্যরা এসে যুক্ত হয়। পদযাত্রী দলটি জাগরণের গান গেয়ে গেয়ে সিকান্দর আলী রোড, সেন্ট্রাল রোড, চৌমুহনা হয়ে মনু সেতুর পাশে অবস্থিত ১৯৭১-এর শহিদদের স্মরণে নির্মিত চাঁদনী ঘাট স্মৃতিসৌধে তখন পদযাত্রী দল প্রায় একশ ছুঁইছুঁই। চাঁদনীঘাট স্মৃতিসৌধ থেকে জাগরণের গান গেয়ে একশ অধিক পদযাত্রীদলকে নিয়ে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মোহিত টুটু চৌমুহনা, কোর্ট রোড হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান বাহিনীর ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার প্রাইমারি টিচার্স ইনস্টিটিউটের দিকে এগিয়ে চলছে। পদযাত্রী দলটি চৌমুহনা অতিক্রম করতেই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক ও উৎসুক জনতা পদযাত্রায় যোগদেন। এভাবে কাশীনাথ আলাউদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজের সামনে আসতেই উক্ত বিদ্যালয়ের দশজন শিক্ষার্থী যুক্ত হয়। এগিয়ে চলা দলটি সার্কিট হাউস অতিক্রম করে পিটিআই-এর দিকে এগিয়ে যেতেই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মোহিত টুটু জেলা প্রশাসকের অফিস কার্যালয়ের সামনে সবাইকে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েন। পদযাত্রী দলকে জেলাপ্রশাসক কার্যালয় দেখিয়ে স্মৃতিচারণ করেন মুক্তিযুদ্ধের সময় এই জায়গায় ছিল মৌলভীবাজার আনসার ফিল্ড যা বর্তমানে জেলা প্রশাসক কার্যালয়। ২৮ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী মৌলভীবাজার শহর দখল নিয়ে এখানে অবস্থান নেন। তারপর আবার ছুটে চলা এবার প্রাইমারি টিচার্স ইনস্টিটিউটের পারিখার দিকে।

বেরীরপাড় স্মৃতিসৌধ থেকে মুক্তিযুদ্ধের পথরেখা ধরে সকাল পৌনে আটটার দিকে সাড়ে তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে প্রায় ১২৫ জন পদযাত্রী প্রাইমারি টিচার্স ইনস্টিটিউটে আসে। প্রাইমারি টিচার্স ইনস্টিটিউটের পরিখার প্রবেশ মুখে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন কমান্ডার গোলাম মুহিবুর রহমান, শহিদ পরিবারের সন্তান আতাউর রহমান মধু ও বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা সন্ধ্যা রানী দেব। পরিখায় প্রবেশ পূর্বে গার্ল-গাইড অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নেটওয়ার্ক শিক্ষক মাধুরী মজুমদার পদযাত্রী দলের সবার সাথে অতিথিদের পরিচয় করিয় দেন। শেষে সবাই হাঁটু গেড়ে বসে, মাধুরী মজুমদার শপথ বাক্য পাঠ করান।

শপথ শেষে সবাই কিছুক্ষণ বাংকারের সামনে অবস্থান নিয়ে ধীর লয়ে বের হয়ে আসার সময় পিটিআই ইন্সট্রাক্টর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, লেখক ও পদযাত্রীদের চা-চক্রের আমন্ত্রণ জানান। চা-চক্র শেষে মুক্তিযোদ্ধারা চলে যাবার পর দেশ টেলিভিশনের মৌলভীবাজার জেলা প্রতিনিধি সালেহ এলাহী কুটি জানান এখন পর্যন্ত বীরাঙ্গনা সন্ধ্যা রানী দেবের নামটি গেজেটে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। পিটিআই থেকে বিদায়ী বেলায় ইন্সট্রাক্টর তালুকদার আমেনা ফজল জানান এই বাংকারের পাশে অফিসে বসে প্রতিদিন দাপ্তরিক কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু কখন এর মর্মকথা জানতে পারিনি। আজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও অভিযাত্রী দলের সহযোগিতায় মৌলভীবাজার গার্ল-গাইড অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে পদযাত্রার মাধ্যমে জানতে পেরেছি নির্যাতনের নীরব স্বাক্ষীহয়ে থাকা এই বাংকারের কথা। পরিশেষে বলেন আগামীতে এই রকম পদযাত্রার আয়োজন করলে পিটিআই সর্বাত্মক সহযোগিতা কবরেন।

কোর্ট রোড এসে সাংবাদিক ও পদযাত্রী বন্ধুদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় গার্লস-গাইড বন্ধু শায়লা, টিনা, সুমনা ও অনামিকা বলেন, আগামী বছর আমরা সবাই পদযাত্রার জন্য প্রস্তুত । শাহ হেলাল উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষিকা অপরাজিতা রায় বলেন এতদিন শুধু জেনে এসেছি পিটিআই-এ মুক্তিযুদ্ধের সময়ের একটি বাংকারের কথা কিন্তু এই বাংকারের ইতিহাস জানা ছিল না। আজ শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ ও পিটিঅই বাংকারের ইতিহাস জানতে পেরেছে। অনুরোধ জানান প্রতি বছর অব্যাহত থাকুক অদম্য পদযাত্রা।

রঞ্জন কুমার সিংহ

অদম্য পদযাত্রা- হাতীবান্ধায়

অভিযাত্রী'র সাথে পরিচয় ঢাকায় থাকার সুবাদে ২০১৭ সালের 'শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা' উপলক্ষ্যে। ঢাকায় পরপর তিনবার পদযাত্রায় অংশগ্রহনের সুযোগ পাই। এরপর গ্রামে চলে আসি। ২০২০ সালের পদযাত্রা করোনার কারনে অভিযাত্রী স্থগিত করে। আর ২০২১ সালের পদযাত্রায় পারিবারিক কারনে অংশ নিতে পারিনি। হাতীবান্ধা থেকে ঢাকার ২০২২ সালের পদযাত্রায় অংশগ্রহন করতে পারবো কি না গতবারের অভিজ্ঞতায় সংশয় দেখা দেয়। তাই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই- ঢাকায় নয় এবার হাতীবান্ধায় একাই হাঁটবো। প্রেরণা যোগায় ২০২১ সালে আমেরিকায় একা 'শোক থেকে শক্তি ঃ অদম্য পদযাত্রা'র দৃষ্টান্ত স্থাপন কারী অভিযাত্রী মনজিলা ইসলাম। এমন সিদ্ধান্তের মধ্যে একদিন ঢাকা থেকে ইমাম হোসেন ভাইয়ের ফোন। তাকে জানালাম, ঢাকা যাওয়া সম্ভব নয় একা হাঁটবো। উনি বেশ খুশি হলেন এবং উৎসাহ দিলেন। সাথে আরও

ক'জনকে যুক্ত করতে পারলে খুব ভালো হবে- এও বললেন।

অভিযাত্রী ২০২১ সালের 'বর্ডারট্রিপ'র সময় হাতীবান্ধায় রাত্রি যাপন করেছিলো। তখন তাদের সাথে দেখা করতে অনেক ছেলে এসেছিল। সেই সুবাদে আশপাশের ক'জন ছেলের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। ভাবলাম তাদের সাথে বিষয়টা শেয়ার করলে কাজ হতেও পারে। প্রথমে লিংকনের সাথে শেয়ার করলে, তিনি স্বপনের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন। স্বপন সরকারী আলিমুদ্দিন ডিগ্রী কলেজে পড়েন। স্বপন তার চারবন্ধুর সাথে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। মধ্যখানে একজন হাঁটা শেষ করেন। আবার নতুন একজন যুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত হাটেন মোটে আমরা সাতজন হাঁটি। দূরত্ব ১০ কি.মি। আমাদের পদযাত্রা শুরু হয় সকাল ছয়টায় হাতীবান্ধা ডাকবাংলো মাঠে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার হতে। ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ এই ডাক বাংলো মাঠে এক বিশাল জনসমাবেশে বাংলাদেশের মানচিত্রঅঙ্কিত পতাকা উত্তোলিত হয়। ৮ এপ্রিল পাক বাহিনী হাতীবান্ধায় প্রবেশ করে অনেক মানুষকে ধরে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে নির্যাতন ও হত্যা করে। শহিদদের বিভিন্ন স্থানে কবর দেওয়া হয়। তেমনি একটি উল্লেখযোগ্য গণকবর বড়খাতা বাস স্টান্ডের পাশে রয়েছে। আমাদের পদযাত্রার সমাপ্তি ঘটে এই গণকবর চত্বরে শপথ বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে।

জাকির সোহান, *সিঙ্গীমারী, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট*

স্বাধীনতার পথরেখায় পদযাত্রা ও তারুণ্যের দৃপ্ত শপথ, জামালপুর-২০২২

জামালপুরে পদযাত্রা শুরুটা হয়েছিলো ২০১৮ সালে ডিসেম্বর মাসে । ২০১৮ সালে আগারগাঁও-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও মুক্তিসংগ্রাম জাদুঘর, জামালপুর যৌথভাবে একটি সভা হয়েছিলো । সভায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ভাই ও এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন ।সেদিন জেনেছিলাম অদম্য পদযাত্রার কথ া। নিশাত মজুমদারের সাথে পরিচয় হলো। আমাদের উৎসাহিত করলেন জামালপুরে অদম্য পদযাত্রা আয়োজনের । ডিসেম্বর মাসে নিশাত মজুমদার অভিযাত্রী দল নিয়ে জামালপুর আসলেন এবং সেবার পদযাত্রা শুরু হয়েছিল জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ ডিগ্রি হোস্টেল থেকে।পদযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন নতুন প্রজন্ম ও নানা পেশাজীবি মানুষ । অভিযাত্রী দল মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান, বিভিন্ন গনকবর ও বধ্যভুমি ছুঁয়ে ১৯ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মুক্তিসংগ্রাম জাদুঘর প্রাঙ্গণে পদযাত্রাটি শেষ হয়। এভাবেই জামালপুর জেলায় শুরু হয় পদযাত্রা।

কোভিড ১৯ মহামারীর কারণে দুই বছর বন্ধ ছিল। এবার ১৪ বা ১৫ মার্চ ঢাকা থেকে ফোনে যোগাযোগ করে রঞ্জন কুমার সিংহ দাদা ২৬ মার্চ, ২০২২ শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রার আয়োজন করার অনুরোধ জানান। তিনি পদযাত্রার পরিক্রমণের পথরেখার ভাবনাটি জানান, শুরু করবেন শহরের মুক্তিযুদ্ধের সম্মু সমর স্থান বেলটিয়া থেকে শুরু করে পিটিআই-পানি উন্নয়ন বোর্ড-শ্মশানঘাট-সাধনা ঔষধালয়-চাঁপাতলাঘাট-বকুলতলা-আশেক মাহমুদ ডিগ্রী কলেজ হোস্টেল হয়ে ফৌতি গোরস্থান বধ্যভূমি পর্যন্ত। সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম এবং ২৬ মার্চ, ২০২২ সাড়ে ছয়টার দিকে বেলটিয়া বীর বিক্রম শহীদ মোতাসিম বিল্লাহ খুররম স্মৃতিসৌধে সবাই সমেবত জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এ বছরের আয়োজন শুরু হয়। জাতীয় সংগীত শেষে ১৯৭১-এর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে পতাকা হাতে নিয়ে অদম্য পদযাত্রা শুরু হয়। পদযাত্রায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, পেশাজীবি মানুষ অংশ গ্রহণ করে। পদযাত্রা দলটি প্রথমে পৌছায় জামালপুর শহরের পিটিআই ও পানি উন্নয়ন বোর্ড বধ্যভুমিতে এখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনির ৩১ বেলুচ রেজিমেন্টের ঘাটি ছিলো। সেনা কর্মকর্তা কমান্ডার লে. কর্ণেল সুলতান মাহমুদ ছিলেন জামালপুর গ্যারিসনের দায়িত্বে । পিটিআই, পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিস ওরেস্ট হাউজ সহ সবগুলো ভবন ছিলো নির্যাতন কেন্দ্র ।

প্রভাতের প্রথম আলোয় সেখানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পদযাত্রা দলটি পৌছায় জামালপুর শ্মশান ঘাট বধ্যভুমিতে সেখানে পদযাত্রীদল ১৯৭১-এর শহীদদের স্মরণে বেদিতে পুষ্পিত ভালোবাসা অর্পন করে। শ্রদ্ধা জানানো শেষে উৎপল কান্তি ধর নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস জামালপুরের গনহত্যার ইতিহাস তুলে ধরেন । স্মৃতিচারণ শেষে জামালপুর উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী গনসংগীত পরিবেশন করেন ।

শ্মশানঘাট বধ্যভূমি থেকে জাগরণের গান গেয়ে পদযাত্রা দলটি পৌছায় শহরে অবস্থিত '৭১-এর নির্যাতনের নীরব ঘাটি সাধনা ঔষধালয় প্রাঙ্গনে । এখানে পদযাত্রা দলটিকে স্বাগত জানায় মানবাধিকার কর্মী জাহাঙ্গির সেলিম, ৭১ টেলিভিশন ও যমুনা টেলিভিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ । নতুন প্রজন্মের সন্তানরা সাধনা ঔষধালয়ে ভয়াবহ নির্যাতনের কাহিনী শোনে তারপর পদযাত্রা দলটি পৌছায় চাপাতলা ঘাট বধ্যভূমিতে। এখানে '৭১-এ পাকিস্তানী হানানাদার বাহিনী রাজাকার আলবদরদের সহায়তায় নিরীহ বাঙালিদের ধরে এনে নদীপাড়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করতো। সমবেত সকলে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে চাপাতলা ঘাট বটগাছ তলায় স্থাপন করা হয় মুক্তির ইতিহাসের স্মারক সাইনবোর্ড।

পদযাত্রা দলটি শহরের প্রধান সড়ক দিয়ে হেঁটে বকুল তলা হয়ে পৌঁছে যায় আশেক মাহামুদ কলেজ প্রাঙ্গনে। পদযাত্রী দল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ছুঁয়ে রাজাকার আলবদরদের ভয়ংকর নির্যাতনের ঘাটি ডিগ্রি হোস্টেলে পৌছালে কলেজ অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ পদযাত্রা দলটিকে স্বাগত জানায় । এখানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বাধীনতার গান পরিবেশন করেন শিল্পী জোনাইদ খালিদ । স্বাধীনতার গান শেষে পদযাত্রা দলটি ফৌতি গোরস্থান গনকবরে যেখানে ৭১ডিগ্রি হোস্টেলে মুক্তিকামী বাঙালিদের ধরে এনে জবাই করে হত্যা করতো। তারপর মৃতদেহ দড়ি বেধে টেনে হিচড়ে নিয়ে ফেলে রাখতো ফৌতি গোরস্থানে । এখানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কবি খন্দকার মাহমুদ, কবি আলী জহির খালেকুজ্জামান, মতিমিয়া ফাউন্ডেশনের সভাপতি স্বাধীন, সংস্কৃতি কর্মি আরজু । অভিযাত্রীরা '৭১ এ গনকবরে নাম না জানা শহীদ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে শেষ হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও অভিযাত্রী দলের যৌথ ভাবে আয়োজন করা শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা ২০২২ । প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অভিযাত্রী দলটির মাঝে পানি ও খাবার পরিবেশন করেন ।

নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত হোক এই প্রত্যাশায় -

হিল্লোল সরকার, *ট্রাস্টি, মুক্তিসংগ্রাম জাদুঘর, কাপাসহাটি, জামালপুর*

অদম্য পদযাত্রা- নাসিরনগর

"শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা" শিরোনামে ২০১৩ সালে ০৭ জনের একটি অভিযাত্রী দল যে পদযাত্রা শুরু করেছিলেন, ২০১৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যুক্ত হলে সেই পদযাত্রা পায় এক নতুন প্রাণশক্তি। এই অভিযাত্রী দলটি শুরু থেকেই স্বপ্ন দেখতো- একদিন "শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা" শিরোনামে দেশের আনাচে-কানাচে নতুন প্রজন্মেরঅভিযাত্রীরা অনুভবের জায়গা থেকে হাঁটবে বাংলার মুক্তিও স্বাধিকার আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

এরই ধারাবাহিকতায় ২৬ শে মার্চ, ২০২২ সালের স্বাধীনতা দিবসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় আয়োজিত হয়েছে এই পদযাত্রা। স্বাধীনতা দিবসের বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় নাসিরনগর উপজেলার কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধের সামনে থেকে শুরুহয়ে গোকর্ণ ইউনিয়নের নূরপুর গ্রামে বীরাঙ্গনার স্বীকৃতি বঞ্চিত কল্পনা রানী দেব এর সমাধিস্থলে গিয়ে পদযাত্রা শেষ হয়।

২০১৬ সালে 'অভিযাত্রী'-র সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। এরপর থেকে নিয়মিতভাবে 'অভিযাত্রী'-র বিভিন্ন আয়োজনে অংশগ্রহনের মাধ্যমে সংগঠনটির একজন স্বেচ্ছাসেবী হয়ে উঠি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও অভিযাত্রী-র যৌথ আয়োজনে প্রতি বছর ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে সাভারে স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত স্বাধীনতা দিবসে আয়োজিত "শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা"-য় আমি নিয়মিতভাবে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশ নিতাম। চাকুরির বাধ্যবাধকতার কারণে ঢাকার বাহিরে থাকায় আমি ২০২১ সাল থেকে পদযাত্রায় অংশ নিতে পারছিনা। ২০২২ সালের "শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা"-র পূর্ব প্রস্তুতিমূলক সভায় অংশ নিতে ঢাকায় গেলে নিশাত মজুমদার আপু ও জাকারিয়া বেগ ভাই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, অভিযাত্রী স্বপ্ন দেখে- একদিন সারা দেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো ছুঁয়েছুঁয়ে এই দিনে অসংখ্য মানুষ হাঁটবে এবং তারা অনুভব করবে কত দীর্ঘ সংগ্রামের

পথ পাড়ি দিয়ে, কত রক্ত দিয়ে, কত ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে পেয়েছি এই দেশ, এই স্বাধীনতা। তাঁরা আমাকে নাসিরনগরে এই পদযাত্রা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। আমি নাসিরনগরে এসে আমার পরিচিত দু'একজন শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলি এবং তারা নিজেরাই তাদের সহপাঠীদেরকে আগ্রহী করে তোলে এবং প্রায় ৩৫ জনের একটি তালিকা করে আমার কাছে নিয়ে আসে। ঢাকাস্থ অভিযাত্রী-র স্বেচ্ছাসেবীদের কল্যাণে নাসিরনগরে আটটি বড় আকৃতির *শেষের পৃষ্ঠায় দেখুন*

অদম্য পদযাত্রা ২০২২

ভারতেশ্বরী হোমস : অনুভুতি

এবারের ২৬শে মার্চের দিনটি সত্যিই আমার জন্য নতুন কিছু ছিল। সকাল ছয়টায় শহিদ মিনারে পৌঁছানোর পরপরই লিসা আপু আমাদের টি-শার্ট দিল। তিনি আমাদের একটা ব্যানারও দিলেন। টি-শার্ট আর ব্যানার দুটোতেই লেখা ছিল "৫২ থেকে ৭১ স্বাধীনতার পথরেখায় পদযাত্রা"। আমরা ভারতেশ্বরী হোমস্ থেকে নয়জন ছাত্রী ছিলাম। সকলে টি-শার্ট পরে ব্যানার হাতে নিয়ে শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়ালাম। হঠাৎ ডান পাশে তাকিয়ে দেখি জাফর ইকবাল স্যার। মানে লেখক জাফর ইকবাল! মনটা খুশিতে ভরে উঠল। শুরুতে জাতীয় সংগীত এবং পরে একটি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করার মাধ্যমে আমাদের যাত্রা শুরু করলাম।

প্রথমে আমরা গান গাইতে গাইতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আমতলা গেটের সামনে গেলাম। এখানে ১৯৫২ সালে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করেছিলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে মিস সুলতানা আমাদের উদ্দেশে কিছু কথা বললেন। এরপর আমরা গেলাম ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। পাকিস্তান আমলের কারাগার। প্রথমে ভেবেছিলাম জেলখানায় কয়েদী দেখতে পাব। কিন্তু গিয়ে দেখি জেলখানা ফাঁকা। বঙ্গবন্ধুকে বন্দি অবস্থায় যেখানে রাখা হয়েছিল সেই কারাগার দেখতে পেলাম। তাঁর ব্যবহৃত জিনিস-পত্র সেখানে সংরক্ষিত আছে। এমনকি যে কামিনী গাছটি তিনি রোপণ করেছিলেন সেটিও দেখতে পেলাম। যেখানে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছিল আ-মরা সে স্থানেও গেলাম। এরপর কারাগার থেকে বের হয়ে আমরা শহিদ ডা. ফজলে রাব্বি হলে গেলাম। সেখানে অনেক দেশাত্মবোধক গান বাজানো হচ্ছিল।

আবার যাত্রা শুরু। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যাবো। গান গেয়ে হাঁটছি। পথ আর শেষ হয় না। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পৌঁছানোর পর পা ব্যথা শুরু হয়ে গেল। একটা দল আমাদের ব্রতচারী নৃত্য দেখালো। ৭১ টিভির দুজন সাংবাদিক আমার আর মালীহার ইন্টারভিউ নিলেন। এরপর আমাদের ফলাহার খেতে দেওয়া হলো। জাদুঘর থেকে গেলাম একটা অনাথ আশ্রমে। আমরা সেখানে একটা গান পরিবেশন করলাম এবং ছোট ছোট শিশুরা শুনে হাততালি দিল। হঠাৎ খেয়াল হলো জাফর ইকবাল স্যার আর নেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আবার হাঁটা শুরু করলাম। আমরা মোট ১৭০ জন ছিলাম। কেউ বেশ জোরে আবার কেউ ধীরে ধীরে হাঁটছিল। যার কারণে আমরা কেউ সামনে, কেউ মাঝখানে আবার কেউ পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম। একজন ভাইয়া আমাদের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। ইমাম ভাইয়া। তার সব প্রশ্নের জবাব দিলাম কিন্তু নাম বললাম না। তাহলে তিনি পা ব্যথার কথা মিস. সুলতানাকে বলে দিতেন। স্নিগ্ধা সবসময় ছিল আগে আগে। যেখানে যাই না কেন সবার আগে থাকে স্নিগ্ধা। আমি আর মালীহা একসাথে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে প্রবেশ করলাম। ছবি তোলা শেষ হলে আমরা লাইন করে এগোতে লাগলাম। সড়কের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আমরা একটা জায়গায় থামলাম। এবার আর হাঁটা নয়। নৌকায় করে তুরাগ নদী পাড়ি দেব।

আমরা নয়জনই নৌকার ছাদে বসলাম। গোলাপ গ্রামে যাচ্ছিলাম। মালীহার পায়ের অবস্থা ছিল করুণ। ফোসকা পড়ে অবস্থা খারাপ। হঠাৎ চিন্ময়ীর ক্যাপ পানিতে পড়ে গেল। বেচারীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। গোলাপগ্রামে পৌঁছে বেগুনবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে গেলাম। আমাদের জন্য সেখানে শরবতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আবার যাত্রা শুরু। আমাদের সাথে একজন দাদু ছিলেন যিনি একজন ম্যারাথন চ্যাম্পিয়ন এবং শিল্পপতি। তিনি আমাদের গান শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলেন। এক ধরনের প্রেরণা ছিলেন তিনি আমাদের কাছে। জোর পাচ্ছিলাম হাঁটার জন্য। এবার শুরু হলো ইমাম ভাইয়ার সাথে যাত্রা। তিনি আমাদের বললেন, 'চলো, আমরা তাড়াতা-ড়ি যাই। তাহলে বিশ্রামের সময় বেশি পাবো।' তিনি আমাদের সাথে আবার গল্প শুরু করলেন।

এরপর হেঁটেই চলেছি। ডেইরি ফার্মের আর দেখা নেই। সেখানে পৌঁছানোর আগে আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরলাম। চোখে ঝাপসা দেখছিলাম ইমাম ভাইয়া আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলেন। কষ্ট লাগছিলো। মালীহা একা একা আসছে। ডেইরি ফার্মে বিশ্রাম নেওয়ার সময় একটি ছোট্ট মেয়ে আমাদের সবাইকে গোলাপ ফুল দিচ্ছিল। আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। লিসা আপু এসে আমাকে গোলাপ ফুল দিলেন। আর শান্তা আপু আমার পায়ে মালিশ করে দিলেন।

আবার যাত্রা শুরু। এবারের যাত্রা পেঙ্গুইন আম্মুর (শান্তা আপু) সাথে। তিনি আমাকে আর মালীহাকে বললেন আমরা তার দুই ছাও। খুব মজা লাগছিল। লিসা আপু, শান্তা আপুর আর আমরা দুই ছাও সবার শেষে যাচ্ছিলাম। এবার আমরা থামলাম শহিদ টিটোর সমাধিতে। এক মিনিট নিরবতা পালন করার পর আমরা রাস্তা পার হলাম। দেখলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথ। শান্তা আপুর থেকে আলাদা হয়ে গেলাম। আমরা খুব দ্রুত হাঁটছিলাম। একপর্যায়ে মালীহা কেঁদে ফেলল। ওর পায়ের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। অনেক ফোসকা পরে গিয়েছিল। অবশেষে পৌঁছে গেলাম স্মৃতিসৌধে। সেখানে শহিদদের স্মরণে আমরা নিরবতা পালন করলাম এবং দেশসেবার শপথ নিলাম।

কষ্ট হলেও দিনটি ছিল খুবই স্মরণীয়। উপলব্ধি করতে পেরেছি মুক্তিযোদ্ধাদের আর শরণার্থীদের হাঁটতে কতো কষ্ট হয়েছিল। এই অদম্য পদযাত্রা আমাকে দেশপ্রেমবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভবিষ্যতে আমি আবার এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে চাই।

প্রেরণা খীসা
ভারতেশ্বরী হোমসের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী

উচ্ছ্বাস আর অপূর্ণতা

১ম পৃষ্ঠার পর

মানুষের অংশগ্রহণে বিশাল শোভাযাত্রায় পরিণত হবে। ইনাম আল হক স্বপ্ন দেখাননি, স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে তিনি এবার ছুটে গেছেন পাবনায়, হেঁটেছেন পাবনার ভাঙ্গুড়া থেকে ফরিদপুর হয়ে সাঁথিয়া উপজেলার সীমান্তবর্তী বাউশগাড়ী গণহত্যার গণকবর পর্যন্ত। ইনাম আল হক যে স্বপ্নের সারথি হয়ে পাবনায় হেঁটেছেন এবং পাবনার কৃতি সন্তান ড. জাহিদ হাসান রঞ্জু যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে সেখানে পদযাত্রার আয়োজন করেছেন ঢাকার অভিযাত্রীদের পক্ষ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে না পারার অপূর্ণতার চাদরে ঢাকা পড়েছে ঢাকার অভিযাত্রীদের হৃদয়।

এবার মৌলভীবাজারের ৫১ জন স্থানীয় অভিযাত্রীদের নিয়ে মাধুরী মজুমদার যখন সেখানকার পদযাত্রার গল্প শোনায় তখন উদ্দীপ্ত হয় অভিযাত্রীরা।

এমনিভাবে মুজিবনগরের পদযাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করতে না পারার মতো এক পাহাড় সমান অপারগতা নিয়ে গল্প শুনি জামালপুরের। জামালপুরে মুক্তিসংগ্রাম জাদুঘরের অন্যতম উদ্যোক্তা হিল্লোল সরকার নিজ উদ্যোগে বরাবরের মতোই যখন পদযাত্রা আয়োজন করে খবর পাঠায় আমরা তখন উজ্জীবীত হই।

জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্য ও নীতিনির্ধারণী অভিযাত্রীদের অনেকেই এবার ঢাকার বাইরে, কেউবা দেশের বাইরে অবস্থান করতে বাধ্য হন। এই অপূর্ণতার চাদর ভারী হতে হতে চাপ দিতে

থাকে আমাদের হৃদয়ে, মস্তিষ্কে। কিন্তু দিন শেষে খবর আসে লালমনিরহাটের হাতিবান্ধায় পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে, ঢাকার অভিযাত্রী জাকির সোহান যেখানে অবস্থান করছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে বৈকালিক পদযাত্রার আয়োজন হয়েছে। অভিযাত্রী মইনুল হোসেন। স্বাধীনতা দিবসের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার সাথে সম্পৃক্ত থাকায়। ঢাকার পদযাত্রার গতিপথ নির্ধারণের অগ্রদূত সোহাগ বিশ্বাস এবার পর্বতারোহণের মৌলিক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ভারতের বরফাচ্ছাদিত সিকিম থেকে ফিরে দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে অবস্থান করছিলেন। সেখানে বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা উড়ানোর মধ্য দিয়ে পদযাত্রার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে হয়েছে।

অভিযাত্রীর অন্যতম সংগঠক ও সমন্বয়কারী পর্বতারোহী নিশাত মজুমদার অফিসিয়াল প্রয়োজনে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থান করছিলেন। স্বাধীনতা দিবসে দুবাইতে প্রতীকী পদযাত্রা করে পারস্য সাগরের পাড়ে তারুণ্যের দীপ্ত শপথ গ্রহণ করেছেন।

বৈশ্বিক মহামারীসহ বিভিন্ন কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এ বছরের পদযাত্রায় সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানাতেও আমরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। এ এক অমার্জনীয় অপারগতা। অথচ সবাইকে অবাক করে কোন অমোঘ টানে সুদুর টাঙ্গাইল থেলে ভারতেশ্বরী হোমস এবং মিরপুর থেকে সোহাগ স্বপ্নধারা পাঠশালার শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যুষে সবার সাথেই জড়ো হয় শহীদ মিনারে। এসওএস শিশু পল্লী আর বেগুনবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক মিলিতভাবে অভিনন্দন জানাতে পথ চেয়ে থাকে পদযাত্রীর পানে। ব্রতচারী দল তাদের নৃত্য দেখানোর জন্য প্রস্তুত থাকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের খোলা প্রান্তরে।

সেদিন এভাবেই অপারগতা আর পূর্ণতায় ভরে ওঠে শহীদ মিনার প্রাঙ্গন। সকাল ছয়টার মধ্যে উপস্থিত হতে না পারার যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করে ফোন করে গণমাধ্যম কর্মী। অসাংগঠনিকভাবেই শুরু হয় পথ চলা। পথে ঘটে পথ হারানো আর ডান বাম বিপত্তি। বিপত্তি ঘটে, অভিযাত্রীর জুতা ছেঁড়া আর পায়ে ফোসকা পড়া। দিন শেষে অন্ধকারে ছেঁড়া পায়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে ১৫৮ অভিযাত্রীর সাথে পায়ে পা মিলিয়ে বিজয়ীর বেশে এগিয়ে যায় স্মৃতিসৌধের কাছে। তখন উচ্ছ্বাস হয়। গর্ব হয় এই প্রজন্মের জেগে ওঠা দেখে।

২৬ মার্চ এর পদযাত্রা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা ছিলো আমার। মাথায় বারবার একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল, যেহেতু স্বাধীনতা ৫১ এ পদার্পণ করছে তাহলে আমিও আমার ৫১ জন রেঞ্জার ও গাইড বোনদেরকে নিয়ে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করবো। কিন্তু এই ৫১ জন মেয়ে যোগাড় করা আমার পক্ষে খুবই কষ্টের ছিলো। কারণ আমরা সুর্যোদয়ের সাথে সাথেই পদযাত্রা শুরু করবো ঠিক করে রেখেছিলাম। বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছিল আমি কি পারবো ৫১ জন রেঞ্জার ও গাইড বোনদের সাথে নিয়ে পদযাত্রা শুরু করতে? তাই আমি মোট ৭৮ জনকে বলে রেখেছিলাম ওরা যেন আমার সাথে পদযাত্রা থাকে। অবশেষে আসলো আমার এই পদযাত্রার ভোর, শাহ মোস্তফা রোডের গণকবরের সামনে যখন দেখছি আমার রেঞ্জার ও গাইড বোনরা একজনের পর একজন আসছে আমি পুরোই অবাক হয়ে গেলাম, আমার টার্গেট ছিলো ৫১ জন আর আমি পদযাত্রার ভোরবেলায় আমার সাথে পেয়েছি ১০৮ জন রেঞ্জার ও গাইড বোনদের। ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে রঞ্জন কুমার সিংহ আমার জন্য টি-শার্ট নিয়ে এসেছিলেন, আমি টি-শার্টটি পেয়ে আরও অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং শোক থেকে শক্তি অদম্য পদযাত্রা ২০২২ এর উপলব্ধি আরও বেশি জাগ্রত হয়েছে। সবাই একসাথে জড়ো হওয়ার পরে জাতীয় সংগীতের সময় আমরা ঢাকার সাথে যুক্ত হই অনলাইনের মাধ্যমে। তখন মনটা খুশিতে ভরে গেলো আমার। পদযাত্রায় যুক্ত হয়ে অনেক অজানাকে জানতে পেরেছি। নিজের দেশ সম্পর্কেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছি। আমাদের দেশ স্বাধীন করার পিছনে যে মুক্তিযোদ্ধাদের এত কষ্ট এবং পরিশ্রম ছিলো তা বলার বাইরে। পদযাত্রায় যোগদান করতে পেরে অভিযাত্রী দলের অনেক আপা এবং ভাইয়াদের সাথে একটা যোগাযোগ হয়েছে। আমি এই প্রত্যয় ব্যক্ত করছি যে, আমাদের মৌলভীবাজার জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি বিজড়িত জায়াগ-ায় এই পদযাত্রা অব্যাহত রাখবো। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই অভিযাত্রীদলকে এত সুন্দর আয়োজন করার জন্য।

শেখ শায়লা আক্তার লিশা
মৌলভীবাজার জেলা রেঞ্জার চেয়ারম্যান
লীলানাগ মুক্ত রেঞ্জার ইউনিট

২০২২-এর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসটি আমাদের জন্য প্রতি বছরের চাইতে একটু ব্যতিক্রমী। কেননা প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস মানেই সকালে বিদ্যালয়ে আসা এবং সবাই একত্রিত হয়ে স্টেডিয়ামে গিয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। বিদ্যালয় থেকে এক সপ্তাহ আগে শিক্ষিকা মাধুরী মজুমদার আমাদের জানান স্বাধীনতা দিবসে গার্লগাইড ও গাইডার মিলে পদযাত্রার আয়োজন করা হবে। পদযাত্রা বিষয়টি আমাদের কাছে একেবারে নতুন। পরে তিনি পদযাত্রার বিষয়টি নিয়ে আমাদের সাথে বিশদ আলোচনা করেন। জানান স্বাধীনতার ৫১ বছরের প্রতীক হিসাবে ৫১ গার্লগাইড ও গাইড নিয়ে ভোর ছয়টায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত বেরীরপাড় গণকবর থেকে পদযাত্রা শুরু হবে আর শেষ হবে পিটিআই বাংকারে। আমাকে আর অনামিকাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় পদযাত্রায় নবজাগরণের গান গাওয়ার জন্য এবার প্রতিক্ষার পালা। ২৬ মার্চ ভোর সাড়ে পাঁচটায় বিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত। একে একে সবাই আসতে শুরু করল। ভোর পৌনে ছয়টার দিকে মাধুরী মজুমদারের নেতৃত্বে বিদ্যালয় থেকে বেরীরপাড় গণকবরের দিকে যাত্রা শুরু করি। ভোর ছয়টায় পদযাত্রী সবাই দুই সারিতে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের জন্য প্রস্তুত। ছয়টা দশ মিনিটের দিকে ঢাকার সাথে অনলাইনে যুক্ত হয়ে আমরা সবাই একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করি। জাতীয় সংগীত পরিবেশন শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুহিত টিটু স্যারের নেতৃত্বে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নবজাগরণের গান গেয়ে পদযাত্রা শুরু হয়। নবজাগরণের গানের সাথে গলা মিলিয়ে পদযাত্রী দলটি সেকান্দর আলী সড়ক হয়ে লেইক রোড, সেন্ট্রাল রোড, সরকারি বালক বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত চাঁদনি ঘাট বধ্যভূমিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। শ্রদ্ধা জানানোর পূর্বে মুক্তিযোদ্ধারা চাঁদনি ঘাট যুদ্ধের কথা আমাদেরকে শোনান। সেখান থেকে আবার কোর্ট রোড হয়ে পিটিআই বাংকারের দিকে পদযাত্রা দলটি অগ্রসর হয়। পিটিআই বাংকারে গিয়ে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। শ্রদ্ধা জানানো শেষে মাধুরী মজুমদার শপথ বাক্য পাঠ করান। এইদিনটা ভোলার মতো নয়। আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজরিত অনেক জায়গা দর্শন করেছি যেখানে আমাদের সাথে বীর মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন। আর আমার নতুন একটি অভিজ্ঞতা হলো। এই প্রথমবার স্কুল থেকে নবজাগরণের গান গাওয়ার এমন একটি দায়িত্ব দেয়া হয়, আমরা নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। আমি আমাদের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানাই, ওনাদের কারণে আজ আমাদের দেশ স্বাধীন। জয় হউক শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা।

সুমনা ঋষি
দশম শ্রেণি, হাফিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

গত ২৬ ০৩ ২০২২ আমাদের মৌলভীবাজারে পদযাত্রা আয়োজিত হয়েছিলো। সেখানে অনেকে এসেছিলো, তার মধ্যে আমি একজন। আমার কাছে এই পদযাত্রা অনেক ভালো লেগেছে কেননা অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পেরেছি আবার অনেক আনন্দও পেয়েছি। বিদ্যালয় থেকে আমাদেরকে জানানো হলো ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে এইখানে পদযাত্রা হবে। এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে বিদ্যালয়ের গার্লগাইড ও গাইডাররা, যা শুনলাম ওহ কি না আনন্দ। আমরা একটা সময় জানতাম না যে আমাদের মৌলভীবাজার জেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিজড়িত অনেক স্থান আছে। এই সকল বীর যোদ্ধারা আমাদের দেশের জন্য প্রান দিয়েছেন, তারা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের কোথায় কবর দেয়া হয়েছে সেটা আমরা জানতাম না। দেশের জন্য কাজ করতে আমি খুব ইচ্ছুক। এই পদযাএার মাধ্যমে অনেক কিছু দেখেছি শিখেছি, এটাই আমার কাছে অনেক আনন্দদায়ক স্মরণীয় মুহুর্ত।

মোনতাহা আক্তার সামছি
মৌলভীবাজার রেঞ্জার ইউনিট

অদম্য পদযাত্রা ৫২ থেকে ৭১ স্বাধীনতার পথরেখায় ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে কিছু গান নিয়ে অংশগ্রহন করেছি। আরো ছিলেন তিনজন মুক্তিযোদ্ধা, ছিলেন ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক, গার্ল-গাইডসসহ অনেকে। সকাল ৬টা মৌলভীবাজার শহরের বেরীর পাড়ে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের গণকবরে পুষ্পস্তবক অর্পনের মধ্য দিয়ে পদযাত্রা শুরু হয়। এরপর গণকবরের সামনে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। বিভিন্ন জাগরণের গান গেয়ে চাঁদনী ঘাট বধ্যভূমিতে শ্রদ্ধা জানাই। সেখানে স্মৃতিচারণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা। উপস্থিত ছিলেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মোহিত, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জেলা কমান্ডার জামালউদ্দীন প্রমুখ। এরপর পুনরায় জাগরণের গান গেয়ে পদযাত্রা শুরু হয়। (পিটিআই) নির্যাতন কক্ষের সামনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মানের শপথ পাঠ করেছি হাঁটু গেড়ে বসে। এসময় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধাকালীন কোম্পানি কমান্ডার গোলাম মুহিবুর রহ-মান, বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা সন্ধ্যা রানী দেব, শহীদ পরিবারের সন্তান আতাউর রহমান। এভাবে আমাদের পদযাত্রা শেষে হয়।

অনামিকা ঋষি
হাফিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
এসএসসি পরীক্ষার্থী

ধরার ধুলায়-২০২২

একা থাকার অনেক সমস্যা সেসব বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে কিছু সুবিধাও আছে। যেমন নিজের ইচ্ছা মতো রান্না ও খাবার খাওয়া যায়। গভীর রাতে প্রায় আড়াইটার দিকে বাসা থেকে বের হই। তবে শক্তি ও সাহস দেয় রবীন্দ্রনাথের গান "খুশি হ তুই আপন মনে।/ রিক্ত হাতে চল্-না রাতে/ নিরুদ্দেশের অন্বেষণে।/

বাসা থেকে বের হতেই কয়েকটা কুকুরের মুখোমুখি। ঘেউ ঘেউ ডাকে তারা আমাকে ঘিরে ধরে। আমি চুপ চুপ বললে একটু চুপ করে আবার ঘেউ ঘেউ ডাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে ঘুরে উলটা রাস্তা দিয়ে চলে গেলাম প্রধান সড়কে। সেখানে কোন যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল শুরু হয় নাই। একটা দুইটা ট্রাক হঠাৎ চলে যায়।

আমি অনেক খানি হেঁটে বাজারে চলে আসি। দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ মশার কামড় খেয়ে শেষে একটা অটো পেলাম সে চান্দনা চৌরাস্তা থেকে যাত্রী নিয়ে এসেছিল সেখানে ফেরত যাবে। আমি ও আর একটা ছেলে তার অটোরিক্সায় চান্দনা চৌরাস্তা আসি সেখানে কিছুক্ষণ থ াকার পর একটা চেয়ার কোচ পাই যেটা মহাখালি যাবে। তাতে করে মহাখালি চলে আসি। এর মাঝে ফজরের আজান হয়ে গেছে। বাস থেকে নামতেই কয়েকজন ভাড়ার বাইক চালক আমাকে ঘিরে ধরে কোথায় যাবো। আমি বলি ভাই শহীদ মিনার যাবো একটা অনুষ্ঠান আছে। মোটরসাইকেলে করে সোয়া পাঁচটার দিকে আমি শহীদ মিনারে আসি। সেখানে দিদার ভাই, হিমু পরিবহণের শামিম ভাইসহ আরে কয়েক জন অভিযাত্রী আসে। আমরা ছবি তুলি খোসগল্প করি। ছয়টা বাজার আগেই জাফর ইকবাল স্যার চলে আসেন। ভারতেশ্বরী হোমস-এর মেয়েরা জাতীয় সংগীত গায় আমরা তাদের সাথে কণ্ঠ মিলাই। এবার রেওয়াজ ভাই আসে নাই। কেন যেনো মনে হয় এবার রাস্তায় গান তেমন জমবেনা। মানে চলতে চলতে গান গাওয়টা রেওয়জ ভাই খুব সুন্দর জমাতে পারেন। পদযাত্রার প্রথমে থাকতে বলা হয় সুন্দরী এপিকে। সে প্রায়ই রাস্তা ভুল করলে বেগ ভাই সংশোধন করে তাদেরকে সঠিক পথে ঘুরিয়ে দেন। যখন জাফর ইকবাল স্যার হ্যামিলিওলিয়নের বাঁশিরওয়ালার মতো ভোর থেকে এসেই যুক্ত হন এবং

সুন্দরবক্তব্য দেন তা আমাদের অনেক অনুপ্রানিত করে। আমরা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য স্থান দিয়ে হেটে হেটে যাই।

আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পৌঁছে ব্রতচারী নৃত্য পরিবেশন দেখি, বিশ্রাম নিয়ে চিড়া দই কলা দিয়ে নাস্তা করি। সোহাগ ভাই সহ অনেকে না থাকলেও বেগ ভাই আছেন। তিনি বেগ দিয়ে নয় আবেগ এর গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে ধীরে ধীরে মিরপুর বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ ও কবরস্থানের ভেতর দিয়ে দিয়াবাড়ি ঘাটে নিয়ে যান। মনে পড়ে এখানে কবরে জেঠা জেঠি তাদের এক ছেলে মনির ভাই আছেন।

দিয়াবাড়ি ঘাটে অনেকেই নৌকা দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। তিনটি নৌকা ভাড়া করা ছিল। আমাদেরকে নৌকা তুরাগ দিয়ে সাদুল্ল্যাহপুর ঘাটে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আমরা সাদুল্ল্যাপুর স্কুলে ইঞ্জিন নৌকার ভ্রমণের ক্লান্তি দুর করে কলের পানিতে ফ্রেস হই। সবারই পেট চো-চো করছে। কিন্তু দুপুরের খাবার আক্রান স্কুলে। আবারও হাটা। হাটতে হাটতে আক্রান স্কুলের মাঠে এসে ভাত সবজি ও ডিমের ঝোল তরকারী দিয়ে পেটপুরে খাবার খেতে খেতে চারটা বেজে যায়। খাবার নিয়ে কেউ কথা বলে নাই। আক্রান স্কুলে সবাই খুব মজা করে সেই সামান্য ভাত খাই।

পথ ঠিক করাই ছিল। এর পর ডেইরি ফার্মের ভেতর দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর মনোরমপ্রকৃতির ভেতর দিয়ে শহীদ স্মৃতিসৌধে আসতে আসতে প্রায় সাতটা বেজে যায়। এযাত্রায় ভারতেশ্বরী হোমসের কিছু ছাত্রী খুব পায়ে ব্যাথা বোধ করছি বলে স্মৃতিসৌধে এসে জুতা খুলে খুরিয়ে হাটছিল। কে যেনো ব্যাথার মলমও লাগিয়েছিল। আমরা বাতাশে তার গন্ধ পাই।

বেগ ভাইয়ের কথায় আমরা নিরবে শহীদ স্মৃতিসৌধের কাছে গিয়ে নূর ভাইয়ের সাথে শপথ বাক্য পাঠ করি। সোয়া আটটার মধ্যেই আমরা সেখান থেকে বের হয়ে ভাড়া করা দোতালা বাসে চলে আসি। আমি তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য সে বাস থেকে নেমে গাজীপুর চৌরাস্তার গাড়ী পলাশ পরিবহণে চলে আসি।

খন্দকার নুরুজ্জামান, অভিযাত্রী, গাজীপুর

শুরুতে পদযাত্রীরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধু এবং চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত স্থান পরিদর্শন করে

পদযাত্রা শেষ হয় সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে, পদযাত্রীদের হাটুগেড়ে বসে শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে

অদম্য পদযাত্রা- নাসিরনগর

জাতীয় পতাকা, লিফলেট এবং ব্যাজ পৌঁছে যায়, যা ছেলে-মেয়েদেরকে আরো বেশি উৎসাহী করে তোলে। তারা ২৫ তারিখে এসে পতাকাগুলি বাঁশে বেধে ট্রায়াল দিয়ে যায় এবং ২৬শে মার্চ নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই ঘণ্টা আগেই এসে হাজির হয়।

বিকাল তিনটায় উপজেলার কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে পদযাত্রা আয়োজনের সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা হাতে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে সারিবদ্ধভাবে পদযাত্রাটি উপজেলাচত্বর থেকে বের হয়ে আশুতোষ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠের পাশ দিয়ে মূল রাস্তায় গিয়ে উঠে। রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাশ দিয়ে পদযাত্রীরা এগিয়ে যায় নাসিরনগর সরকারি কলেজের দিকে। সেখান থেকে ফুলপুর বাজার এবং তারপর নূরপুর বাজারের পাশদিয়ে পদযাত্রীরা পৌঁছে যায় নূরপুর গ্রামে, যেখানে রয়েছে পাকবাহিনীর পাশবিক নির্যাতনের স্বীকার হয়ে মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও বীরাঙ্গনার স্বীকৃতি বঞ্চিত কল্পনা রানী দেব এর সমাধিস্থল। সেখানে কল্পনা রানী দেব-এর ভাই শেখর চন্দ্র দেব (মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাননি) এবং একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা উপস্থিত ছিলেন। তারা পদযাত্রীদেরকে তাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন স্মৃতি বর্ণনা করেন। এরপর নাসিরনগরের নবীন অভিযাত্রী দল দেশ সেবার শপথ নেন এবং কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এভাবেই প্রথম বারের মতো নাসিরনগর উপজেলায় আয়োজিত "শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা-২০২২" সম্পন্ন হয়।

মো: মইনুল ইসলাম, স্বেচ্ছাসেবী, অভিযাত্রী, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official